যামিনী রায়

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৪.

প্রকাশক : শীলা ভট্টাচার্য
[illegible]শা প্রকাশনী
[illegible]৪, মহাত্মা গান্ধি রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : দিলীপ দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭বি, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : অমিয় রায়

সূচিপত্র

যামিনী রায়ের কথা

যামিনী রায়ের চোখে দৃশ্য জগৎ বাস্তব সত্য এবং তা একান্তভাবেই। তাঁর পক্ষে যা চাক্ষুষ তাই সত্য। তাঁর নিজের মুখের কথা শ্রোতার মনে যে ছাপ দেয় তার যাথার্থ্য যামিনী রায়ের নিজের কথা এবং আশ্চর্য বাংলা কথা। এ ক্ষেত্রে appearance বা রূপ ছাড়া সত্য বা বাস্তব কি রকম যেন নীরক্ত লাগে। এবারে একটু অশরীরী এবং টুকরো টুকরো তাঁর শিল্পকথার কিছু নমুনা দিই :

১। যামিনী রায় বলেছেন : আপনি কি রাষ্ট্রপতির ফটো দেখেছেন খবরের কাগজে তিনি উচ্চপদে বসার পর ?

আমি বললুম—না।

যামিনী রায় বললেন : সব সময়েই তাঁর গোঁফ ছিল নিশ্চয়—কিন্তু এখন যেই না গদিতে বসেছেন, একটা নতুন শক্তি তাঁর গোঁফে এসেছে। গোঁফ দাঁড়িয়ে উঠেছে বাঘের মতো আত্মপ্রত্যয়ে।

আমি হেসে ফেললুম, এবং বললুম—ফটোগ্রাফটা নিশ্চয় গদিয়ান হবার খবরের আগের ফটো—গতকালের আগে তোলা। কিন্তু যামিনীদা মানতে পারলেন না, কারণ যা প্রত্যক্ষ (appearance) তাই হচ্ছে সত্য। অন্তত তাই হওয়া উচিত।

২। একদিন আমার বন্ধু হীরেন মুখার্জি—সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা, বিদ্বান এবং বুদ্ধিজীবী—আর আমি তার স্টুডিওতে, বাগবাজারের বাড়িতে গেছি। শিল্পী খুব বন্ধুভাবে অন্তরঙ্গতায় বললেন—আমি আপনাদেরই সঙ্গে আছি, একটা আমূল রূপান্তরের পক্ষে। আচ্ছা, আপনারা কি ভেবেছেন—কি রকম পুলিশ আমাদের হবে ? তাদের পোষাক ও পাগড়ি বা টুপি কি রকম হবে ?

হীরেনবাবু: আমার মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় ওই একটা ডিটেল্-এর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত ভাবি নি।

যামিনী রায়: ওটা একটা ছোট ডিটেল্? আপনারা বিশ্বাস করেন যে আপনারা একটা ভাবী পরিকল্পিত সমাজ ভাবতে পারেন নিজের মনে ছবিটা না ভেবে, অন্তত খানিকটা, গভর্ণমেণ্টের যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার—পুলিশের সাজপোষাক সেটা কি হবে। এরকম ভাবে চললে আপনাদের শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন একেবারে ঘেঁাট পাকিয়ে যাবে।

৩। ১৯৪৭ সাল নাগাদ তাঁর কাছে আমাদের প্রদেশের বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। যামিনীদা তাঁরই ভাষায় 'পোট্রে'ট-'-এ বা চেহারায় শিল্পীর চোখের অভিজ্ঞতায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। চিন্তিত হলেন উক্ত রাজ্যের মঙ্গলের বিষয়ে। এবং যখন সেই বিমূঢ় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, শিল্পী আরো বিচলিত হলেন, এবং বললেন: না মশায়, আপনাকে দিয়ে তো হবে না। আপনি রাজ্য চালাতে পারবেন না।—কিন্তু শুধু খুদে মানুষের আকার এবং মুখচোখভঙ্গি দর্শকের মনে ছাপ রেখে যায় না, আসলে মানুষের গোটা ব্যক্তিত্বই জাতশিল্পীর চোখে প্রত্যক্ষ। (এবং ঐ রাজনীতি-ধুরন্ধর সত্যিই দেশের উপকার করতে পারেন নি।)

৪। এক বার বাংলা দেশের শিল্পের বড় প্রদর্শনী গভর্ণমেণ্ট হাউসে হয়। এবং লাটপত্নী মিসেস কেসি যাঁর উদ্যোগে ঐ প্রদর্শনী হয়েছিল, যামিনী রায়কে প্রাক-প্রদর্শনীতে আহ্বান করে নিয়ে যান। যামিনীদা ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনীর সব বস্তু দেখছিলেন, এবং সেই সময়ে দীর্ঘ মার্বেল পাথরের মেঝের উপর দিয়ে লাটসাহেব এলেন। সঙ্গে এক ইংরেজ এ-ডি-সি বা এ-দ-কঁ এবং তাঁদের এগিয়ে গিয়ে সম্ভাষণ করলেন আমাদের বাঙালি মস্ত একজন গণ্যমান্য পুরুষ, যাঁর চেহারা ও শরীর সত্যিই প্রকাণ্ড। যামিনীদা বললেন: আমার হঠাৎ মনে হল, আমি যেন দেখছি এক রাজ-গোখরোর স্বাধীন গতিবিধি, তার মারাত্মক ক্ষমতার সম্পূর্ণ জ্ঞানে, আর যুবাটি যেন এক নবীন তাজা কেউটে। আর তারপরেই তুলনায় এসে দাঁড়ালো আমাদের এক নেতা, তাঁর প্রকাণ্ড ঢ্যামনা সাপের শরীর নিয়ে, যে সাপের কামড় আছে, কিন্তু মারণবিষ নেই।

আচ্ছা যদি তুমি সাপ হতেই চাও, কামড়ের ক্ষমতা নিয়ে, তাহলে তো তোমার শক্ত উদ্ধত দাঁতে মৃত্যু থাকবে।

৫। অবশ্য যামিনী রায় তাঁর স্বভাবধর্ম অনুসারে জন্তুজানোয়ারের বিষয়ে বিরূপ, সন্ত্রস্ত ছিলেন, যেমন তিনি মানুষের দায়িত্বেও সন্ত্রাসের বিষয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে আমাদের এক খুব প্রিয় বন্ধু, তখন লাটভবনবাসী, এক শালীন উৎসাহী ইংরেজ, মনে আছে, একদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা তাঁর ঘনিষ্ঠ বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে বসে যামিনীদার বাগবাজারের ভাড়া-বাড়িতে নানা কথা, ইংরেজি-বাংলায়, আলোচনা করছিলেন, অন্তরঙ্গ হাওয়ায়। এবং তখন একবার সভ্যতার বিভিন্ন জাতীয় ভেদাভেদজনিত যুক্তিতে শিল্পী বললেন: আপনারা দুজনেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনি আমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু আপনি তো কোনোদিন আমায় মেরে ফেলতে পারেন না, অথচ উনি আমায় যতই ভালোবাসুন, যে কোনো মুহূর্তে উনি আমায় গুলি করতে পারেন। আপনার পাশে তাঁকে বসে থাকতে দেখছি. আর আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি তাঁর বন্দুক, রিভলবার, তরোয়াল—তাঁর বসায়, চলায়, গোটা শরীরের ধরনে।

৬। গত মহাযুদ্ধে এক সময়ে 'লেন-দেন' যুগে মার্কিন সরকারের এক কর্তাব্যক্তি যামিনী রায়কে একটি ছবি এঁকে দিতে বলেন যাতে লোকে বুঝতে পারবে ভারতের ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল প্রোগ্রেস উন্নত হচ্ছে। ছবির দাম যতই হোক না কেন—'ভারত-সাহায্য প্রোগ্রামে'র জন্যে। কিন্তু যামিনী রায় ঐরকম ধার-করা প্রগতিতে বিশ্বাস করতেন না, তাই রাজি হন নি, ঐরকম চিত্রকর তিনি তো ছিলেন না। তাঁর নিজের ধারণাই ছিল অন্য রকম, আমদানি-করা পাশ্চাত্য পণ্যবিপ্লব,—ঐরকম ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল উন্নতি ভারতে স্বাভাবিক নয়। চাষবাস আর পণ্যোৎপাদন আলাদাভাবে চলে না। ভারত তাই সেই যুগে একটা ইস্পাতের ছুঁচ বা সুচও করতে পারে নি, আমদানি করতে পারত মাত্র। 'দেশের মানুষ ছাড়া কি করে দেশের যন্ত্র-পাতির বিকাশ হবে? দ্রব্যের ব্যবহার দেশের মানুষই করতে পারে। তোমরা কেন অন্তত কয়েকটি দেশকে ছেড়ে দাও না!'—তিনি বলতেন—'তারা স্ববশ থাকুক না। তোমরা না হয় একটু বিদেশে পিকনিক করো। তোমাদেরই নানা পণ্যদ্রব্য ও কৌশল থাক্ না।' যামিনীদার মনে হত যে ওরা তাঁর কাজে মুগ্ধ, কারণ তাঁর কাজে মানুষের হাতের চোখের নিজের সুকুমার বা শিল্প কাজই মুখ্য।

৭। যামিনীদার নানা বিষয়ে উক্তিতে অনেকের মনে হত আপাত-দৃষ্টিতে স্বভাবতই নানা মানবিক স্ববিরোধ। এবং তা থেকে থেকে তাঁরও মনে হত, এবং তা বলতেনও। তিনি তো নিজেই বলতেন, দুনিয়ার অনেক কিছু তাঁর মনোমতো হয় না, কিন্তু সবই জানতে হয়, কারণ সবই মানুষের। একেই বোধহয় পাশ্চাত্য জ্ঞানী বলেছিলেন a new discipline of suffering। যামিনীদার আপাতস্ববিরোধী এই সব কথাবার্তা—এবং তিনি যেমন ছবি আঁকতেন তেমনি আমাদের মূলত শান্তিনির্ভর জীবনযাত্রার ও স্বকীয় কর্মের বিষয়ে উৎসারিত চিন্তাপূর্ণ কথাবার্তা যথাযথ বা স্বাভাবিকই লাগত—অন্তত আমরা যারা তাঁর মানস ও জীবনযাত্রার পরিচয় পেয়েছি—প্রায় ১৯৩০ থেকে।

বস্তুতপক্ষে, স্থানকালপাত্র হিসাবে—এমনকি দর্শকের ও শ্রোতার স্বভাব বা প্রয়োজন হিসাবে যা তিনি বলতেন, তা সহ-অনুভূতির ডায়ালেকটিকে—দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তরণে—শুনলে পড়লে দেখলে স্পষ্ট মূল্য পেত।

একদিন, মনে আছে, সোভিয়েট দূতাবাসের ঐ উচ্চপদস্থ সহৃদয় ও বিচক্ষণ বন্ধুকে যামিনীদার বাড়ি নিয়ে যাই, তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে জন্মদিনের উপহার দেবেন যামিনীদার একটি ছবি দিয়ে। আমরা ঘণ্টা দুই এ-ঘরে সে-ঘরে ছবি দেখে দেখে কাটালুম। তারপরে তখনও এক ছাদখোলা বারান্দা বা রোয়াকে গেলুম, সামনেই ঘাসজমি ও দু-একটি গাছ—ঘনায়মান অন্ধকারে আমরা তিনজন। আমায় কমরেড এর্‌জিন বলছেন প্রশ্ন করতে, আর আমার কথার জেরে যামিনীদা বলে যাচ্ছেন তাঁর চিন্তা—মানবজীবন, সভ্যতার গতি ও চূড়ান্ত সার্থকতা কি রকম হওয়া উচিত—স্বায়ত্তশাসন শুধু নয়, স্বায়ত্ত সরল জীবন, প্রতিযোগিতা নয়, মুক্ত কিন্তু স্বয়ম্বশ। শহরের জীবনযাত্রা আর গ্রামীণ জীবন কতটা ভিন্ন, কোনটা কত সার্থক, ব্যক্তি-স্বাধীনতা কিন্তু সংলগ্ন, স্বার্থোত্তর জীবনযাত্রা। যে ভূগোলে, যে ইতিহাসে মানুষ হয়, বাঁচে, চিন্তা করে, সে সবই তো এক হিসাবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র। কিন্তু আবার মোটমাট মানুষই, মানবিকই ইত্যাদি। জীবনযাত্রা সকলের ভিন্ন ভিন্ন হাওয়ায়, ভূগোলে, মাটিতে ভিন্ন। রেষারেষি নয়, জড়াজড়িও নয়, ভূগোল ও ইতিহাসে ও সমাজজীবনের বিন্যাসের ইতিহাসে ভিন্নও বটে আবার একও বটে। যামিনীদার মতে এক পর্বে হয়তো Centralised বা কেন্দ্রীভূত-ভাবে মানুষের জীবন হবেই, কিন্তু আদর্শ লক্ষ্য হবে স্বতন্ত্র, ছোট ছোট গোষ্ঠী,

ছোট ছোট ভূগোলের ভাগ ও বিন্যাস, জলমাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মানুষের জীবন। খাদ্যও তাই, জলমাটিহাওয়া অনুসারে যা স্বাভাবিক। আবার তা-ই মানুষের পক্ষে ও তার শরীরমনের পক্ষে স্বাভাবিক। বৈচিত্র্য তো থাকবেই কিন্তু আবার ঐক্য বা মিলও। স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়াও থাকবে, কিন্তু সে সবই জীবনের বাস্তবে, ছোট স্বার্থে নয়, কিন্তু স্থানকালপাত্রানুসারে। মানুষ একই, আবার স্বাধীনও তো, ভূগোল-ইতিহাসও তাই। বাঁচা, কাজ করা —বিলাসী পণ্য নিয়ে টাকার লোভে রেষারেষি নয়, তাই কি বলুন? ইত্যাদি।

মনোযোগস্তব্ধ রুশ শ্রোতা নিচু গলায় বললেন: উনি কি জানেন, এই যে আশ্চর্যভাবে উনি যে সব কথা বলছেন সে সব কথা সবচেয়ে প্রাগ্রসর মার্কসীয় চিন্তা? উনি তো আমাদের ভাবী মানবসমাজের স্বপ্ন, যা আমরা কেউ কেউ ভাবতে আরম্ভ করেছি—ওঁরই মতো—তাই তো উনি বলছেন? শুনতে শুনতে এর্‌জিন সন্ধ্যার ছায়ায় রুশশোভন আবেগে যামিনীদাকে চুম্বনই করে ফেললেন। পরে যামিনীদা বলেছিলেন: আচ্ছা এরা তো কমিউনিস্ট রাশিয়ার মানুষ, এরা বুঝি মনে নাড়া পেলে এই রকম চুমু খায়?

৮। যামিনী রায়ের বিপরীত স্বভাব সমরসেট ম'ম ভারত দেখে শুনে আমাদের চাষীদের রৌদ্রেবৃষ্টিতে অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে বলেছিলেন বিশ্বে সবচেয়ে শুদ্ধ 'ট্রাজিক বীর' বা নায়ক এবং তাদের জীবন সর্বাপেক্ষা মহাকাব্যিক বীরত্ব ও সহ্যশক্তিমণ্ডিত।

চাষীই তাই যামিনীদার পক্ষে মূল মানবীয়তার মূর্তি নব-এপিক অর্থে। এবং তাই তিনি বলতেন যে মানবের জীবনে যা কিছু সংকল্পিত বিন্যাস—বা প্ল্যান তার মধ্যবিন্দুতে কৃষকের স্থান। তিনি যে একান্তভাবে এই মানসিকতাকে গ্রহণ করেছেন, তা তাঁর স্বকীয় নির্বাচন, তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপের স্বকীয় বিকাশ।

তাই তিনি বলতেন:

"আমি গ্রামের মানুষ, তখনও গ্রামে শহরের অস্বাভাবিক জীবন দাগ রাখে নি। বাবা কিছুদিন সরকারী চাকরিতে ছিলেন। চাকরি তিনি ছেড়ে দিলেন, গ্রামে ফিরে এসে চাষীর জীবন আরম্ভ করলেন। আমাদের গোটা পরিবার আত্মীয়স্বজন জাতে ও অবস্থায় সমাজের ওপর তলারই মানুষ ছিলেন। গ্রামে দুটি গোষ্ঠী ঐরকম ছিল। মায়ের পরিবার বেশ স্বচ্ছল

ছিল। কিন্তু তবু তিনি আমার বাবার স্বেচ্ছায় সরল গ্রামীণ জীবনে সহায় ছিলেন। বাবা তুলোর চাষ করতেন, তাতে সুতো করতেন, গ্রামের তাঁতীদের দিয়ে আমাদের জন্যে ধুতি শাড়ি করাতেন। তারা লাল পাড়টা করতে পারত না, স্বামীর জীবিত অবস্থায় মেয়েদের তো পাড় রাখতে হয়, মাকেই লাল সুতো দিয়ে সরু পাড়ের একটা কিছু করতে হত ঐ মোটা কাপড়ে (সধবা মানুষ তো!)। সর্ষে চাষ থেকে সর্ষের তেল, মাথায় মাখার জন্যে তিল তেল। বাবার স্থির বিশ্বাস ছিল, প্রকৃতির নিয়মে জল-হাওয়ায় অঞ্চলের মাটিতে যা ফলে তাই সে অঞ্চলের মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি নিজে গরু ছাগল ভেড়া মোষ রাখতেন। তখন গ্রামের কাছে বড় বেশ জীয়ন্ত বনজঙ্গল ছিল, সে বনে বেশ জন্তুও ছিল। তাই তিনি গরু ছাগল মোষের ছাউনি ঢাকা আশ্রয়ে বা গোশালায় রাত্রে নিজেই শুতেন। বাবা চাষীদের বাউরিদের পছন্দ করতেন। পেন্সিলের বদলে কাগজে নখ দিয়েই ড্রইং শেখান। বংশের গর্বও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু মাকে ক্ষেতখামারে নিজেকেই খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হত, আমাদের অনেক বাউরি ছিল, কাজ করত। (যামিনীদার গ্রামে তাদের ভাষা আমিও শুনেছি, অত্যন্ত সাধু ভব্য ভাষায় তারা কথা বলত)। বাবা বলতেন, আমাদের সকলের এক হাতে যেন বই, অন্য হাতে লাঙল।"

তাঁর চিত্রাঙ্কণের ইতিহাসের কথা আমরা অনেকেই হয়তো শুনেছি এবং তাঁর আবাল্য জীবনেরও ইতিহাসের আভাস পেলে আমাদের জ্ঞানের সুবিধা হয়। যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে, (শুনেছি) এপ্রিলের মাঝামাঝি, বাংলা বছরের শেষ রাত্রিতে। যশোহর রাজবংশে তাঁর পিতৃপুরুষরা জড়িত ছিলেন এবং রাজার হত্যাদেশের জন্যে তাঁরা মল্লভূমের বিষ্ণুপুররাজের আশ্রয়াথী হন। অর্থাৎ রায় মশায়দের জমিদারির পত্তন হয় প্রতাপাদিত্যের যশোহর থেকে কচু রায়ের আত্মরক্ষার্থে মোগল দরবার থেকে বর্তমান বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুররাজের আশ্রয় নেওয়ায়। বিষ্ণুপুর-রাজ তাঁকে উচ্চবংশশোভন জায়গীর দিতে চান রাজসভার কাছাকাছি। কিন্তু রাজারাজড়ার দরবারী অভিজ্ঞতার পরে রায় মশায়রা জঙ্গলে জায়গা চান, বিষ্ণুপুর থেকে কিঞ্চিৎ দূরে, বেলিয়াতোড়ে। বেলিয়াতোড়ের কাছেই জঙ্গল আরম্ভ, মানভূম থেকে মেদিনীপুর জেলা অবধি। শৈশবে যামিনীদা প্রাচীন বড় বাড়ির ও বসতির

বাইরে কিন্তু গ্রামের কাছেই পিতার সঙ্গে শুতেন। যামিনীদার ভাষাই উদ্ধৃত করি : "বাবার পাশে শুয়ে শুয়ে কান্‌তুম (কাঁদতুম), বাবা বলতেন—এই দেখ আমার পাশে দা (অস্ত্র) রয়েছে, তোমাকে কোনো জন্তুই কিছু করতে পারবে না।" শালবন অদূরেই ছিল, এবং সে জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর আক্রমণও হত। বহুকাল পরে জীমূত নামক তাঁর গুণী শিল্পী পুত্র কলকাতা থেকে যায় দুই বন্ধুর সঙ্গে এবং জীমূত হারিয়ে যায় আর তার বন্ধুরা খুঁজে ব্যর্থ হয়ে যামিনীদার বাড়িতে ফিরে যখন জানায় তখন আত্মীয়বন্ধুদের সাহায্যে জীমূতের যুবকদেহ পাওয়া যায়—ক্ষতবিক্ষত যুবকের মুখশরীর।—এই ঘটনা একবার বেলেতোড়ে বলতে বলতে যামিনীদা শুয়েই পড়েছিলেন মনে আছে। কথাটা উঠেছিল যখন অমিয় বা পটল নামক যামিনীদার গুণী শিল্পী চতুর্থ পুত্র আমার কৌতূহলের উত্তরে বলেছিল : কাকাবাবু, জঙ্গল এখন প্রায় কমে কমে সে জঙ্গল নেই, আপনি যাবেন একবার বেড়াতে? যামিনীদা অত্যন্ত বিচলিতভাবে বললেন : না, না, ও জঙ্গলে কেউ যাবে না।

যামিনী রায়ের গ্রামীণ মনোবৃত্তি ও তাই থেকে নিজের শক্তির বিকাশ ও নানাবিধ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় তিনি কলকাতায় এসেও বাবু-কালচারে হারান নি। আর একটা কারণ হয়তো তাঁর অসাধারণ পিতার উদাহরণ এবং তাঁর নিজেরও স্থির কৃতিত্ব। তাঁর গ্রামীণ চারিত্র্য নিশ্চয়ই আবাল্য পুষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর বেশ কয়েকজন আত্মীয় বেশ শৌখিন ছিলেন। কেউ কেউ, যেমন বসন্তরঞ্জন রায় আমাদের পুরোনো সাহিত্যে পণ্ডিতও ছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি তাঁরই আবিষ্কার। যামিনী রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমিদার-বংশের শৌখিন মানুষ হয়ে প্রায় সত্তর বছর আগেই, শতাব্দীর গোড়ার দিকে, কলকাতায় বাস করতে যান। যখন বাবুরা খুবই মোটর গাড়ি চাপতেন, তখনই তাঁর মোটর গাড়ি ছিল, তিনি ড'সনের জুতো ব্যবহার করতেন, বাড়ি ভাড়া করে কলকাতায় বাস করতেন। যামিনীদার মনে এর থেকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন মনোবৃত্তি কাজ করেছিল। নানারকম সামান্য রোজগারের কাজ তিনি কলকাতায় এসে প্রথম দিকেই আরম্ভ করেন। তাই তাঁর কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতাও হয়েছিল বিচিত্র ও গভীর এবং এ সবই তাঁর স্বীয় শিল্পকর্মে কাজে লেগেছিল। তিনি একাধারে শহরের মানুষ ছিলেন, আবার দেশজ, গ্রামীণ মানুষও ছিলেন। তাই তাঁর কথায় চিঠিতে প্রায়ই মুগ্ধ করত তাঁর সরল কিন্তু গভীর প্রজ্ঞা এবং ব্যাপক জ্ঞান। তিনি যেমন

চিত্রশিল্প-বিষয়ে নানা সমস্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং অনেক রকমের শিল্পকার্য, অনেক রকম পট, অনেক রকম কারিগরি করতে পারতেন, তেমনি অনেক রকম যন্ত্রপাতি রাখতেন ও ব্যবহার জানতেন। এবং তাঁর গ্রামের কারিগর—ছুতোর, কুমোর, পটুয়া, ডাকসাজশিল্পী সকলের কাজে তাঁর নন্দন ও জ্ঞান ছিল। পাশ্চাত্যে যেমন পিকাসোর বহুমুখী শিল্পচর্চা ও জ্ঞান, আমাদের দেশে যামিনীদারও তা-ই ছিল। অধিকন্তু তিনি অনেক কিছু প্রথম বয়সেই কলকাতায় এসে চর্চা করেন।

বাঁকুড়ার এক মুসলমান জেলা-কর্তা বাঁকুড়া-বাসী তাঁর জ্যাঠামশায়ের মাধ্যমে ডেকে ছবি-আঁকার কাজ দেখে তাঁকে কলকাতার আর্টস্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তরুণ যামিনী রায় কলকাতায় এলেন কিন্তু সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই তাঁর অভিষ্টে ছিল এবং বাস্তবেও বটে। যামিনীদার মুখে অনেক দিন অনেক কথা শুনেছি তাঁর জীবিকা ও স্বাধীন জীবনযাত্রার আদর্শ। যামিনীদা কলকাতাবাসী শৌখিন দাদার আহ্বান শোনেন নি, উত্তর কলকাতাতেই একটা ঘর ভাড়া করে ছোট ভাই রজনীকে নিয়ে থাকতেন।

যামিনী রায়-কে অবনীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পোর্ট্রেট নিয়ে কপি করতে বলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই বসে। যামিনীদার জ্বর হয়ে গেল, এবং তাঁর কাছেই শুনেছিলুম যে একটি ফরসা ছেলে—এই, বছর নয় দশ বয়স, পাখার হাওয়া করত আর গান শোনাতো। ছেলেটি কি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর? যামিনীদা বলেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। যামিনী রায়-এর পোর্ট্রেট-কাজ অনেক বাড়িতেই হয়তো এখনও আছে, যথা অরুণ সিংহদের বাড়িতে। যামিনী রায় বলতেন: একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুরবাড়িতে, নিজের কাজকে ব্রত, চরম দায়িত্ব হিসাবে পালন করেন। তা, তাঁকেই আপনি বলতে পারেন একালের এক বিরাট মহাপুরুষ।

অল্প বয়সেই যামিনী স্বাধীন জীবনযাত্রায় নির্ভর করেন। তাঁর দাদা সেই সময়েই মোটর-কার রাখেন। কিন্তু যামিনী উত্তর কলকাতা থেকে হেঁটেই আর্টস্কুলে যেতেন, এবং দাদার বইয়ের ব্যবসায় আড্ডির দোকানে বই পৌঁছে দিয়ে স্কুলে যেতেন, আনা চারেক করে পারিশ্রমিকও পেতেন। অধিকন্তু, তিনি এক সময়ে এক ইহুদি ব্যবসায়ীর জন্যে রঙিন কার্ড এঁকে দিতেন—বোধহয় বড়দিনের সময়ে। একশো কার্ড, দশ বারো আনায় এক প্লেটভাত খেতে পেতেন! লিথোগ্রাফিক এক ছোট

কারবারে, গলির এক বাড়িতে রোয়াকে বসে লিথোর কাজ করতেন, বোধহয় উত্তর কলকাতায় দর্জিপাড়া অঞ্চলে। তিনি আমায় বলেছিলেন, ঐ গলির রোয়াকে মাঝে মাঝে এক বালক দাঁড়িয়ে তাই দেখত। তিনিই ভাবীকালের বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ বসু! ঠিকে-ঝিদের সঙ্গে বসে উত্তর কলকাতার বটতলা পাড়ায় তিনি বড় বড গরানহাটা এন্‌গ্রেভিং ছবির বর্ডারে রং দিতেন—নামমাত্র মূল্যে, কঞ্চি বাঁশ ,ছুলে। পরে আমরা দেখতে পাই যে স্বনামধন্য ফরাসী শিল্পী ফের্নাঁ লেজের ঐ মোটা টানে ছবি আঁকতেন—যেন পাড় দিয়ে ধরে রাখা। তিনি সন্ধ্যার দিকে শ্যামবাজারের কাপড়ের দোকানেও বসতেন, শাড়ি বিক্রি থেকে তিনি রঙের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে বোঝেন,—কোন্ পেশা বা বৃত্তিতে কিরকম রুচি হয়,—যেমন ধোপানীরা একরকম, মেথরানীরাও। যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ' নাটকের জন্যে তিনি বড় বড় স্টেজের সীন্ এঁকেছেন, দোকানের টিন এঁকে দেখেছেন, সবেতেই নানান্ টেকনীকের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি বহু বছর বাংলা থিয়েটারেও যেতেন,—যথা স্টার্ থিয়েটারের উল্টো দিকে একটি ঘরে শচীন সেনগুপ্ত, নাট্যকার ও সাপ্তাহিক-লেখক, থাকতেন এবং সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে, এক কাপ চা খেয়ে দুজনে থিয়েটারে যেতেন। সেখানেই বোধহয় পাঁজি-জাতীয় বিজ্ঞাপন-সম্বলিত এক বই নাড়তে নাড়তে বৈষ্ণব মহাজন স্বরূপ দামোদরের কথা পড়েন এবং বহুবার বলেন। ঐ কথাগুলি তাঁর মনে গভীর হয়ে রইল।

শ্রীহট্ট থেকে চৈতন্যদেবের এক ভক্ত প্রশস্তিরচনা করে বাংলায় আসেন এবং রচনাটি মহাপ্রভুকে দেবার জন্যে স্বরূপ দামোদরের কাছেই যথারীতি তাঁকে যেতে হয়। মহাপ্রভুর জ্ঞান যেমন গভীর ছিল ভক্তিও তেমনি ছিল এবং উত্তেজনাও তাই গভীর ছিল। বৈষ্ণবসাহিত্যে জীবনীতে তার অনেক ইতিহাস আছে। স্বরূপ দামোদরও তাই নতুন কেউ এলে সহজে চৈতন্য-দেবের সঙ্গে দেখা করতে দিতেন না, যাতে প্রভুর কোনো অস্বস্তি না হয়, দশা না হয়। আগত মানুষটি চৈতন্যকে ঈশ্বরের তুল্য বলে রচনা লেখেন এবং স্বরূপ দামোদর নাকি কান ঢেকে বলেন—কাকবিষ্ঠাতুল্য। যামিনীদার মনে বহুবছর ধরে ঐ কথাটা কাজ করেছিল।

আর্ট স্কুল তখনও বর্তমান মর্যাদা পায় নি।—অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ছাত্র জীবনে যে ইটালিয়ান চিত্রাঙ্কন-শিক্ষক ছিলেন, সেই গিলার্দি শাহেব আর্ট

স্কুলেও শিক্ষকতা করেন। যামিনীদার কাছে শুনেছি, লাইফ ক্লাসের চালে তিনি নানান প্ল্যাস্টার মডেল নকল করাতেন। অসহায় ছাত্ররা অত্যন্ত নিচু বেঞ্চিতে বা চৌকিতে বসে কাপি করত। আর দীর্ঘকায় গিলার্দি দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে মাস্টারি করতেন, কাপি ঠিক হচ্ছে না বলে মন্তব্য করতেন। একদিন নবীন যামিনী বলেন: আপনি দেখছেন লম্বা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে আর আমরা নিচু বেঞ্চিতে বসে বসে ড্রয়িং করছি, এ দু-রকম দেখায় ছেলেরা কি করে আপনার দেখাটা দেখবে? শাহেব বেজার হলেন।

কিন্তু আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল পর্সি ব্রাউন শাহেব যখন একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখলেন যামিনী কারোর ক্লাস না করে চৌরিঙ্গির দিকে জানলার খড়খড়ি তুলে দাঁড়িয়ে।—এখানে সময় নষ্ট করছ! তরুণ যামিনী রায় বললেন: না, সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে হবে, তাই এই ছড়ানো দৃশ্যকে সীমায় কেটে না বাঁধলে তো ছবি হবে না, খড়খড়ি তুলে দেখলে সেটা হবে। ব্রাউন মহাখুশি হয়ে যামিনীর পিঠে হাত থাবড়ে বললেন: **That is the way, you are right, Jamini,** যামিনী তুমি ঠিক ধরেছ।

পরে ব্রাউন যখন তাঁর ময়দানের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কর্তৃত্ব ছাড়েন এবং বিলেতে ফেরবার জন্য ও তাঁর পারিবারিক দুর্যোগের জন্যে চলে যান, শিল্পরসিক শাহেদ সুরাবর্দির কাছে শুনি ব্রাউন শাহেবকে কলকাতার বেশ কিছু ভদ্রলোক মিউজিঅম বাড়ির দক্ষিণ দিকে এক বিদায়সভার ব্যবস্থা করেন এবং কিছু ভাষণও হয়। শাহেদকে ব্রাউন শাহেব বলেন: যামিনীকে বলো আমার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা কিছু বলতে, তাতে আমি খুব খুশি হব, সে এখানকার সবচেয়ে বড় শিল্পী-ছাত্র। আলি শাহেব ও শাহেদ যখন বলেন, তখন যামিনীদা তাঁর স্বভাবমতো সঙ্কোচে-দ্বিধায় দাঁড়িয়ে উঠলেন ও কয়েক সেকেণ্ড পরেই বললেন: আমি ছবি আঁকি। আমি কিছু বলতে পারব নি। শাহেদের কাছেই শুনেছিলুম যে ব্রাউন বললেন: ইউ আর রাইট্, ইউ আর রাইট্ যামিনী!—বলে সভাভঙ্গে পিঠে হাত দিয়ে আবার বলেন: আই এম্ প্রাউড অব্ ইউ!

আর্ট স্কুলে যামিনীদার অবাধ স্বাধীনতা। ব্রাউন আপিসে জানিয়ে দেন: যামিনী মাইনে না দিলেও যখন তার ইচ্ছে হবে সে আসবে, ক্লাসেও যেতে পারবে, আপিসকে আমার নির্দেশ। যামিনীদা কখনও কখনও আসতেন, আবার মাঝে মাঝে কিছু কিছু—সামান্যই রোজগার করতে নানারকম কাজ

করতেন। যেমন উত্তর কলকাতার এক গলিতে এক প্রবীণ লিথোগ্রাফারের সঙ্গে লিথোর কাজ করতেন। আর্ট স্কুল বা আর্ট কলেজে তার একটি নমুনা মুকুল দে-র সময়ে প্রিন্সিপালের ঘরে দেখেছিলুম।

প্রথম দিকে যামিনীদা কমিশন্ড্ চিত্ররচনা করতেন, কিছু কিছু ছবি নিজের শিল্পীমনের তাগিদেও. আঁকতেন। সে সময়ে অবশ্য তাঁর আয়-ও ভালো ছিল। ক্রমে ক্রমে মধ্যতিরিশে তাঁর শিল্পমানসে এক সংকটবোধ এল। এত সহজে তাঁর হাতে পাশ্চাত্য রীতির অঙ্কন আসত যে তাঁর জিজ্ঞাসা তীব্র হতে লাগল: যাকে বলে রিয়ালিষ্টিক পোর্ট্রেট–তার নন্দতাত্ত্বিক সার্থকতা কি বা কতটুকু?

বস্তুতই, যামিনী রা'য়ের পক্ষে দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব যথার্থ ছিল। শ্রোতার কাছে যে ভাবে তাঁর কথার ভাষায় যাথার্থ্য আনতে পারতেন এবং খুব স্বকীয় স্বাভাবিকভাবেই প্রায় বাঁকুড়ার বেলেতোড়ের ভাষায়, তাতে শ্রোতার পক্ষে বক্তব্য সরল কিন্তু জোরালো হয়ে উঠত। সাধারণত আমাদের কলকাতার পাতি ভাষায় বা শাহেবী বাবুভাষায় শব্দের ব্যবহারে, বিশেষ প্রয়োগে, উচ্চারণের ছন্দে ঐ ভাষায় এসে যায় নীরক্ত বৈশিষ্ট্যহীনতা–অবশ্য তার মাঝেও নানান্ বৈচিত্র্য আছে,–অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে থাকত–যেমন যজ্ঞিবাড়িতে বাড়ির ছেলেরা পাচকদের বা পরিবেশকদের হাঁক দিত–'বান্ ঠাউর, এদিকে ছোঁকা আনো, ওদিকে ডাল দাও!'

যামিনীদার ভাষা সাধুই হোক বা কথ্যই হোক, তার স্বকীয় জোর ছিল প্রবল, তা সে অর্ধ-পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গেই হোক বা অন্তরঙ্গ বন্ধু-স্থানীয়দের সঙ্গেই হোক। এমনকি বাগবাজারের বাড়িতে ঠিকে-ঝি (বা পার্টটাইম) বলে যে দাসীরা কাজ করত, তার কাজে হয়তো বৌদিদি ত্রুটি দেখলে বলতেন। আর যামিনীদা নীচের ছবির ঘরে কাজ করতে বসে বা এদিক ওদিক যেতে আসতে বলতেন: 'গড় করি মা, তোমায় গড় করি–ছুটা বাড়িতে এই কাজ করো!' যামিনীদা 'কাজ করা'-র বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমী। শেষ অসুখ হবার আগে পর্যন্ত তিনি ভোরবেলায় উঠে দিনকৃত্য আরম্ভ করতেন, তখন দাড়িও কামাতেন। শেষের বছর দুই-তিন আগের থেকে বলতেন, দাড়ি কামাতে গেলে ডান হাতটায় অস্বস্তি হয়। নিজেই 'গলাকাটা' ক্ষুর দিয়ে কামাতেন, শুচি বোধ করে নীচে নেমে ছোট

বাগানের গাছ থেকে একটি-দুটি ফুল তুলে কোনো এক বড় ছবিতে রাখতেন তা বিকেলে বা সন্ধ্যায় গেলেও দেখেছি—তখন তিনি ডিহি শ্রীরামপুর লেনে,—পরের নাম বালিগঞ্জ প্লেস ঈস্টে তাঁর একটু ঘাসের জমি ও কিছু লতাগাছ ছিল। তাঁর বাড়িতে একতলায় শিল্পপ্রেমিক সকলেরই অবাধ গতি ছিল।

অত্যন্ত বন্ধুবৎসল উদার মানুষ যামিনী রায় ছবির বিষয়ে খুবই কঠিন হতে পারতেন, যাকে ইংরেজরা বলত: হি ক্যান বি এ ডিফিকাল্ট ম্যান। উদাহরণ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যামিনীদা একসময়ে তাঁর আরেক প্রিয়জন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র উৎসাহে ও আনুকূল্যে কুড়িটি চিত্রের এক এলবম্ ছাপাতে রাজি হয়েছিলেন। সুধীনবাবু ইংরেজিতে একটি উপাদেয় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ও লংম্যান্স্ মিসেলানিতে ছাপান। লেখাটি ঐ এলবমের ভূমিকা হবার প্রস্তাব ছিল। ছবির ব্লকের প্রুফ যামিনীদাই বলেন তিনি দেখে দেবেন। তাঁর প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতাও ছিল রঙিন ব্লক তৈরির: একদা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি ঘোষ এক জর্মান-বিশারদকে আনেন রঙিন ছবি ছাপাবার ব্যবস্থা করতে। তিনি ভারতীয় চিত্রপটু সহকর্মী চান, এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদে তখন ওখানে কাজ করছেন, যামিনী রায়কে ঐ কাজের ব্যবস্থা করেন। ফলে যামিনীদা শুধু ছবি আঁকা নয়, ছবি ছাপানোতেও আমাদের এক আদি বিশারদ হন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও যামিনী রায়ের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। অনেক পরে 'পরিচয়'-এর সুধীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে যামিনীদা কয়েকটি ব্লক-ছবির প্রুফ্ দেখতেন, কিন্তু তাঁর মনোমতো ছাপার কাজ হচ্ছিল না বলেই বোধহয় কয়েকটি ব্লক ছাড়া আর কাজটা শেষ করলেন না, যদিও সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। তিনি সত্যিই ছবির বিষয়ে খুঁতখুঁত বা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন। একটা দুটো উদাহরণেই পাঠক বুঝবেন: আমাদের ছোট মেয়ে তারার পরীক্ষার পরে তিনি তাকে বলেন, রোজ এসে এই ঘরে ছবি আঁকবি। তারা রোজ নিয়মিত আঁকত, তিনি কিছু কিছু সংশোধন করতেন, আবার আঁকতেও বলতেন। মনে আছে, একদিন তিনি সমস্ত ছবিটা তুলি দিয়ে গাঢ় রঙে ঢেকে দিলেন—খুচরো সংশোধনে তিনি বিশ্বাস করতেন না। যামিনীদা তারার আঁকা ছবি এক বিদেশী ক্রেতাকে বিক্রি করেন। টাকাটা একবার তারাকেও দেন। তাঁর গুণী শিল্পী পুত্র এবং স্টুডিও-র সব কাজে

এসিস্টাণ্ট এবং সহকর্মী অমিয় রায় বা পটল পর্যন্ত একদিন বিচলিত হয়ে পড়েছিল। লেখকের একটি তেল রং পোর্ট্রেট পটল যখন দেখাতে ও উপহার দিতে আনল, তখন তার মহাশিল্পী পিতা বললেন: পটল, বাবা ছবিটা একবার আমায় দাও, মুখের ওপরটায় হাইলাইট্‌টা ঠিক করে দিই। পটল জানত যে তার অসাধারণ পিতা খুচরো সংশোধনে বিশারদ হলেও তাঁর মন চাইত গোটা-টাই ঠিক করে দিতে। তাই পটলের আঁকা তৈল-চিত্রটি সবটাই পটলের আঁকা রইল। কিন্তু লংম্যানসের জ্যাক্ অ্যাডামসের উৎসাহ সত্ত্বেও, এবং আমাদের অনেকের বৈঠক সত্ত্বেও সে ১০০ ছবির বইটি বেরোল না। সত্তর বছরের মহাশিল্পী যামিনীদা একদিন এসে বললেন: ও বই যদি আপনারা ছাপাতে যান, তাহলে আমার মৃত্যু হবে। আরেক প্রায় সমকালীন শিল্পী ও তাঁর শান্তিনিকেতনী ভক্তদের ভালো লাগবে না এবং যামিনীদার পক্ষে তা অস্বস্তিকর। সুতরাং ঐ লংম্যানসের সচিত্র বই বেরোল না—যদিচ পণ্ডিত নেহরুকে কমিটির পৃষ্ঠপোষক করা হয়। ফলে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট এবং দিল্লির ধুমিমলদের সচিত্র বই ছাড়া যামিনীবাবুর বিষয়ে অনেকদিন আর বই বেরোয় নি। প্যারিসে ছাপা ফাইডন্-প্রেসের বই বেরোবার কথাও বাস্তব হয় নি, যেমন হয় নি এক খ্যাতনামা মার্কিন প্রকাশকের ইচ্ছাও, কারণ ছবির বিদেশী ছাপার প্রুফ্ যামিনীদাকে কলকাতায় দেখানো প্রকাশকের পক্ষে ঝঞ্ঝাট বেশ।

আমরা অনেকেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ স্ট্রীটেও যামিনীদার ছবি দেখতে গিয়েছিলুম। প্রথম বাগবাজারের গলির বাড়িতে জলধর সেনের শিল্পোৎসাহী পুত্র অজিত সেন যিনি কল্লোল-আপিসে নিয়মিত আসতেন, তিনি নিয়ে যান। তাঁর বন্ধুত্ব ছিল দীনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে এবং এঁরা যামিনীবাবুর ছবি ছাপাতেন কল্লোল-পত্রিকায় হালকা বা একরঙা ব্লক দিয়ে। অজিতবাবু আমায় একদিন আনন্দ চাটুজ্জের গলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্টেলা ক্রামরিশ তখন ভারতীয় শিল্পজগতে কাজ করতেন। তিনি উঠোনের চৌকাঠে জোর করে আলপনা দিয়েছিলেন। আমি আর সেই আলপনা ডিঙিয়ে ঢুকি নি। যামিনীদার কাছে পরে শুনেছি সাহিত্যপরিষদের এক অনুষ্ঠানে নন্দবাবুও ঐ রকম আলপনা-শিল্প করেন—বঙ্কিমচন্দ্রের উপলক্ষে, কিন্তু মার্বলের মেঝেতে! যামিনীদা চলতি দেশজ ভাষায় নন্দবাবুকে বলেন

যে বঙ্কিম বেঁচে থাকলে বিষ্ঠা লেপে দিতেন, কারণ আলপনা মার্বল মেঝেতে মানায় না। যামিনীদার শিল্প বিষয়ে ঔচিত্যবোধ প্রবল ছিল।

জীবজন্তুর বিষয়ে যামিনীদার অস্বস্তি ছিল, তাঁর পক্ষে যা ছিল স্বাভাবিক। তিনি যখন বেলেতোড়ে শেষবার যান ও মাস কয়েক ছিলেনও, জাপানী যুদ্ধের সময়ে যখন কলকাতায় দুটো চারটে বোমা পড়ে। এবং তাঁকে কলকাতা ছেড়ে তাঁদের গ্রামে গিয়ে থাকতে হয়। সেখানে ভয়ের কারণ কমই ছিল। কিন্তু খবর—বাস্তবে ও গুজবে রটত কিছু কিছু। তা ছাড়া মাঝে মাঝে মার্কিন উড়োজাহাজ—সুপারফোর্টেস উঁচুতে উড়ে যেত। এবং আমাদের মহৎ শিল্পীর স্নায়ু বিচলিত হ'ত। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে নানা রকম গুজবও মুখে মুখে চলত বৈকি। তিনি মাস ছয়েক ধরে বাগবাজারের গলি ছেড়ে গ্রামে বসে আঁকতেও পারেন নি। এ ঘর ছেড়ে ও ঘরে গিয়ে, বারান্দায় পাঁচিল তুলেও ছবি আঁকতে পারে নি, অথচ তিনি অত্যন্ত সরু চলনে বা গলিতে বসে বাগবাজারে তো বটেই, পরে নিজের ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতেও সরু চলন-গলিতে আঁকতে পারতেন অথবা নিচু এক ঘরে নানান্ ছবির মধ্যে বসে নিয়মিত কাজ করতেন।

যুবক-শিল্পী জীমূতের মৃত্যুতে যামিনীদার নিশ্চয়ই শিল্পকার্যে সহায় কমে গেল। বালক পটল অর্থাৎ অমিয়কে যামিনীদা নিজের কাজে লাগালেন। পটলের ছবিআঁকার হাত ও ছবির গঠন তখনই জোরদার ছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ছবির টেম্পেরা, তৈলচিত্র, পোর্ট্রেট-এর হাত আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করত, এখনও করে। অধিকন্তু এখনও, মোজেইক আর কাচ-এর স্বচ্ছ ছবি তৈরিতে তার কৃতিত্বে অনেকেই খুশি। অমিয় রায়ের নানারকম কৃতিত্ব ও কর্তৃত্বে মুগ্ধ হতে হয়। অমিয়র বাল্যকালেই—বছর পাঁচেক বয়স থেকে—পিতা তাঁকে ছবির নানা কাজে লাগিয়ে দেন এবং আমাদের দেখাতেন। এবং অন্য পরিবারের বালকবালিকাদের ছবিও প্রচুর সংগ্রহ করে রাখতেন। সেগুলি বার করে বলতেন: এই ছবি দেখেই কোন্ পরিবারের আবহাওয়ার ছেলে বা মেয়ে বোঝা যায়। কিন্তু অমিয় রায়ের নানাবিধ সবল কৃতিত্ব দুর্লভই বটে।

১৯৩৫-এ আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রণতি দে বাগবাজারের গলির বাড়িতে

বোধহয় প্রথম যান – তাঁর স্মৃতির সহায়তা লেখকও পেয়েছে। তাঁরও আমার মতো মনে আছে যে সমস্ত বাড়ি, সংসার যেন এক সুরে, এক ঐকতানে বাঁধা, বিরাট কাজ করতে হলে যেমন বাঁধা হয়। (তখনও যামিনী রায়ের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, চাহিদা পরের অবস্থার তুলনায় কিছু কমই ছিল। তার ভিত্তিতে ছিল যামিনীদার চিত্রাঙ্কনের নতুন যুগের কাজ, তখন তিনি পোর্ট্রেট আঁকার সহজ আয় ছেড়ে শিল্পনীতির স্বকীয় প্রেরণা ও রীতির কাজে মগ্ন। তাঁর সহধর্মিণী শ্রদ্ধায় তাও মেনে নিয়েছিলেন। তাই তো তিনি বলেছিলেন যে এক সময় গেছে যখন ছেলেমেয়েদের শুধু (তখনকার) ১ পয়সা মুড়ি খেতে দিতেন। এই পারিবারিক বীরত্বের বর্ণনা যারা শুনেছে, তারা আজও তা ভুলতে পারে না।

বীরত্বই বটে এবং সর্বদাই শিষ্টাচার আর নিত্য পরিশ্রম। আমাদের দেশেরই এক ভারতীয় আই. সি. এস্ – সর্ আবদুর রহিমের পুত্রের ইওরোপীয় স্ত্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এক পোর্ট্রেট্ আঁকেন, সেটির এক খুব কম সময়ে সংশোধিত পোর্ট্রেট এঁকে যামিনীদা আমাদের অবাক করে দেন – অল্প সময়ে দ্রুত আঁকা সেই লাল টাই ও সবুজ শার্ট পরা আর সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট চোখের চাউনি দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু সেটি সংরক্ষিত হয় নি। প্রথমত সৌজন্যে, তিনি মেমশাহেবের ছবির পরিবর্তিত রূপ রাখেন নি। দ্বিতীয়ত যামিনীবাবু প্রায়ই বিশেষ অঙ্কন শেষ হলেও প্রয়োজনমতো আর কোনো ছবি আঁকার তাগিদ বোধ করলে, সেই কাপড়ে বা বোর্ডেই আবার নতুন ছবি আঁকতেন দেখেছি। ফলে অতুল বসু মহাশয়ের আঁকা সুধীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেটটিই বোধহয় এখনও তাঁর একমাত্র পোর্ট্রেট। হিংসাত্মক বা হননের ছবির মধ্যে তিনি বোধহয় দুটি ছবি বাড়িতে রেখেছিলেন। তার একটি দেখেছি ইংরেজ শাসনের সময়ে পল্টনরা দেশের লোককে মারছে, – এ ছবিটি 'সাহিত্যপত্র'-তে ছাপা হয়। আরেকটি বাইব্‌লের ম্যাসাকর্ অব দি ইনোসেন্টস – যিশুর ভয়ে নিষ্পাপ শিশুদের রোমক-শাসক হিরডের হুকুমে হত্যার ছবি।

যামিনী রায়ের অসামান্য জীবনযাত্রা এবং শিল্পীকীর্তির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রায় বছর চল্লিশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই লেখকের পক্ষে বর্তমানে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা আমার শারীরিক অক্ষমতার জন্যে সম্ভব নয়। আই ক্ষান্ত হচ্ছি পাঠকদের ও শিল্পরসিকদের কাছে মার্জনা নিশ্চিত জেনে।

যামিনী রায়

যামিনী রায়ের চিত্রাবলী এতই চিত্রগুণে শুদ্ধ, যে তাঁর বিষয়ে ভাষায় লেখা সক্ষম হলেও মূলত ব্যর্থ হতে বাধ্য। সচরাচর এই চিত্রগুণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আক্রমণে কাবু দেখা যায়। তাই আমরা গল্প না পেলে চিত্রকে দুর্বোধ্য তো বলিই, তার সামাজিক সত্তাও দেখতে পাই না। মাতিসের মতো যামিনী রায়ের দীর্ঘ চিত্রসাধনার বিষয়ে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। ফলে আমরা হয়তো তাঁর বিশেষ দু-একটি ধরনের ছবি পছন্দ করতে পারি, কিন্তু তাঁর কীর্তির সামগ্রিক উৎকর্ষ উপলব্ধি আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়।

কারণ মাতিসের সঙ্গেই তাঁর শিল্পস্বভাবের কিছুটা তুলনা সম্ভব হলেও, এক হিসাবে তাঁর বিকাশের বহুবিধ ঐশ্বর্যের তুলনা মেলে খানিকটা পিকাসোরই সঙ্গে, যদিচ পিকাসোর বুদ্ধিখর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর অস্থির কৌতূহল বা পিকাসোর মায়ামমতাহীন গড়ে ভাঙা ও ভেঙে গড়া এক স্বতন্ত্র শিল্পস্বভাবের ইতিহাস।

বাঁকুড়ার এক অন্তর্বর্তী গ্রামে তাঁর জন্ম। লোকসংস্কৃতির অবশেষে ও অপেক্ষাকৃত আঞ্চলিক সচ্ছলতার মধ্যে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর শৈশব তাঁর জীবনের বিকাশে নিরর্থক নয়। শিল্পের প্রাণ সন্ধান এবং সামাজিক জীবনের আত্মসম্পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর এই গ্রামীণ পটভূমিতেই আরম্ভ। এরই স্মৃতি তাঁকে ভুলতে দেয় নি কলকাতার নকল বুর্জোয়া জগতের পশ্চিমা প্রাকৃতবাদী শিল্পমার্গের অসারতা। তাঁর নিজের হাতের অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও। কারণ ইওরোপের প্রথাসিদ্ধ শিল্পরীতিতে যামিনী রায়ের কৃতিত্ব ইওরোপের বাইরে অভূতপূর্ব। অবশ্য এই ইওরোপীয় রীতির যুগে তাঁর বিস্তৃত কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছে, বিশেষ করে দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহ ও মুখের টাইপের জ্ঞান তাঁর তুলিতে মজ্জাগত হয়ে গেল এই পোর্ট্রেটের যুগেই। এবং রেখাসংক্ষেপের দখলও এসে গেল এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

সুনাম ও পসারের মধ্যে যামিনী রায়ের মানসিক যন্ত্রণা মোড় ফিরল, সন্ধিক্ষণের বিপ্লবী দিকে, ব্যক্তিগত স্টাইল বা রীতির সামাজিক শিকড়ের অন্বেষায়। প্রথমত রূপান্তরের তাগিদ তাঁর এল তাঁর তৎকালীন শিল্পসাফল্য এবং তাঁর দর্শক-ক্রেতা বাবুসমাজের সম্বন্ধের মধ্যে মানসিক অসারতা বা উভয়ত প্রাণবস্ত শিল্পপ্রেরণার অভাব উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়ত তিনি দেখলেন যে ঐ পূর্বোক্ত কারণেই আমাদের জেবলী বা উন্মূল শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতিতে ইওরোপের ওস্তাদের ঐতিহ্য চালান করা ব্যর্থ চেষ্টা। তাছাড়া এদেশের কড়া রৌদ্রের আলোয় ছায়াবর্ণাঢ্য প্রথাসিদ্ধ তৈলাঙ্কনের অর্থহীনতাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হল।

তখন থেকে তাঁর তপশ্চর্যা, সারল্যের অভিযানে অবিশ্রাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথমদিকেই তাঁর সাফল্য দেখা যায়,—বহুর মধ্যে একটি ধরনের উদাহরণই দেওয়া যাক, তাঁর সাঁওতাল মেয়েদের বা পুরুষদের মনোরম ছবিগুলি, কিংবা কৃশ বাংলার মা, বাহুতে ছেলে। যামিনী রায় তখনও তেল-রং ব্যবহার করেন, কিন্তু লঘু মসৃণ টানে। এ সময়েই দেখা যায় তাঁর ছবিতে রংগুলির পারস্পরিক সমান চাপের দিকে একটা ঝোঁক। দেখা যায় আকারগত এবং রেখাগত শুদ্ধতা এবং রঙের একটা ভাবব্যঞ্জক গঠনমূলক ব্যবহার।

অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য চিত্রকর হয় আকারের ভাস্কর্যমূলক সমস্যায় কম-বেশি ভাবিত থাকেন (সেজান্ থেকে পিকাসোর অনেক কাজ অবধি) নয়তো রঙের লিপিমূলক ঐশ্বর্যবিস্তারে ঝোঁক দেন (ইম্প্রেশনিস্ট থেকে মাতিসের অনেক কাজ অবধি)। যামিনী রায় চিত্রের গঠনময়তা আর ভাস্কর্যে কঠিন স্পর্শসহতা কখনও এক ভাবেন নি, আবার বর্ণাঢ্য রেখার স্পষ্টতাও তিনি কখনও হারান নি বর্ণের বিলাসে। ভারতবর্ষের শিল্পের ঐতিহ্যে তিনি দরবারী মিনিয়েচর রীতিবিলাসকে কোনোদিনই মূলধারা ভাবেন নি।

তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উচ্ছল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈত্যরূপের নিশ্চিত ঋজুতায়, তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাবগঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপংক্তির রঙিন শক্তিতে। তাই তাঁর পরীক্ষা চলল আমাদের চোখের প্রাথমিক অন্তরস্থ জালিধূসরের সারল্যে, যে ধূসর, চোখ খুললেই রূপের কাঠামোতে হয়ে পড়ে আকাশের অনন্ত নীলিমা। এই ধরনের ছবিগুলি আঁকা তুলির

একটানে, ধূসর পটভূমিতে, ভূসোরঙে; যামিনী রায়ের চোখের এবং কব্জির ধ্রুব নিশ্চিত শক্তিতে এই সব ছবিতে আসে বিষয়বস্তুর গঠনবেষ্টতা—তা সে মা হোক বা শিশু হোক বা বৃদ্ধ মানুষ বা হরিণ বা বাংলার বিধবা মেয়ে। এবং সেটা আসে পরিপ্রেক্ষিতের স্তরবিন্যাসে নয়, আসে শুধু অধরা ধূসরের পটে কৃষ্ণ রেখার ধৃতসীমার সবল টানের চাক্ষুষ ব্যাপ্তিতে। এই সব রেখা-শরীরের দেহভার হয়তো যাঁরা শুধু পারসীক মিনিয়েচর দেখে কাটান বা যাঁরা তথাকথিত নব্য-ভারতীয় ছবির ভক্ত তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে, যেমন যাবে তাঁদের কাছে যাঁরা শুধু ক্যামেরার চড়া ছায়াতপে অভ্যস্ত, যে কড়া শাদা-কালোর তুলনাবৃত্তিতে চোখ খোলার মুহূর্তে মানবচক্ষুর পক্ষপাতহীন ধূসরিমার কোনো স্থান নেই।

যামিনী রায়ের প্রতিভা অবশ্য এই সিদ্ধিতে বিরাম মানে নি। যাঁরা তাঁর তুলির অবিরাম রেখার সঙ্গে কালীঘাটের জের-টানা রেখার তুলনা করে সন্তোষ পান যেন তাঁদেরই অধিকতর হতভম্ব করতে তিনি শেষ করলেন বিরাট দেয়ালচিত্রের একটি গোটা সারি। রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার কঠিন মাধুরীতে এই চিত্রমালার চৈত্যপ্রমাণ মূর্তিগুলিতে এক নতুন সৌন্দর্যের উন্মেষ। বলাই বাহুল্য, যে-কোনো গুণী শিল্পীর মতো যামিনী রায় সর্বদাই পাঠ নিতে প্রস্তুত, এবং বাংলার পট বা পাটা, রেমব্রাণ্ট বা ভানগখ, কিছুই তিনি তুচ্ছ করেন নি। কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচনক্ষম সজ্ঞান শিল্পী এবং তাঁর রুচি ক্ষণকালের জন্যও তাঁর তুলিকে ছাড়ে নি, অন্যপক্ষে লোক-শিল্পীরা প্রায় অভ্যাসিক কারিগর এবং সুরুচির সমান মাত্রা সচেতনতা ছাড়া না থাকাই স্বাভাবিক। এই বড় বড় ছবিগুলিতে চৈত্যমাত্রিক বলিষ্ঠ আকার যেমন মুখ্য তেমনি এদের আলংকারিক সৌষ্ঠবও অবিচ্ছেদ্য। এই সার্থকতা সম্ভব শিল্পীর হাতের অসামান্য দক্ষতায়, তাঁর চিত্তের একাগ্র অনুসন্ধিৎসায় এবং একান্ত শিল্পীদায়িত্ব-বোধে আর দেশের লোকের ভালোবাসার উৎসে নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে ডোবাতে পারলেই। এই ছবিগুলিতে ঘনতা পটসন্ততিতে বা স্থানযোজনায় এমনভাবে বিন্যস্ত যে শিল্পীর গঠন-সুনম্যতার কর্তৃত্ব আপাতদৃষ্টিতেও স্পষ্ট অথচ তাঁর মূর্তিগুলি বা চিত্রদেহগুলি চিত্রগতই, ভাস্কর্যগত নয় এবং এ ভেদেই তাঁর শিল্পসিদ্ধির আরেক প্রমাণ।

কিন্তু যামিনী রায় এখানেও থামেন নি। যেন রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার পরিচিত রসাভাসে পাছে তাঁর পরীক্ষা বহির্মুখ থেকে যায়—আসলে অবশ্য

এ পরীক্ষা তাঁর মানসের গভীর আবেগবহ দ্বন্দময় প্রেরণাই—তাই শুদ্ধির খোঁজে তিনি খুঁজলেন পুরাণের বাইরে, তৈরি অনুষঙ্গের বাইরে তাঁর চিত্রের উপজীব্য। বাউরি, সাঁওতাল, সাধারণ চাষী, সাধারণ জীবনযাত্রারত মেয়ে-পুরুষ এরা হল তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু। শুদ্ধ চিত্রসাধনায় তারা অবশ্যই নির্বিশেষ, সাধারণ, কিন্তু তবু তারা টাইপ, প্রতিভূ মানুষ সব। তাদের মুখ ভিন্ন, শরীর ভিন্ন, ভঙ্গি ভিন্ন এবং বাঙালির কাছে তারা চেনা, আত্মীয়। তাই তারা মনকে এত নাড়া দিয়ে যায়, শুদ্ধ ছবির বেষ্টনীতে প্রত্যক্ষ জীবনের রসাভাসে—মহৎ শিল্পের আপাতবৈপরীত্যগুণে খণ্ডিত সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধের শিল্পগত ডায়ালেক্‌টিকে। বুর্জোয়া স্বার্থে ইওরোপের শিল্পে যে মানুষে মানুষে ভেদের উপরেই ঝোঁক পড়েছিল গত কয়েকশত বছর ধরে, সে ঝোঁক তিনি শুধু নেতিতে ভাঙেন নি, ভারতবর্ষের বিশেষ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কিছুটা সাহায্যে তাঁর সমাধান শ্রেণী-উত্তীর্ণ না হলেও কিছুটা আস্তিকও বটে।

শিল্পের সীমা যামিনী রায় সর্বদাই মানেন, সেখানেই তাঁর শিল্প-সাধনার মুক্তি। আধুনিক পশ্চিমা শিল্পবিদ্রোহীদের কথা তিনি প্লেটোর মতোই মানেন—জ্যামিতির আকারে, ঘন, গোলনলিকা ও উপবৃত্তই হচ্ছে প্রাথমিক রূপাকার। তবে, তারপরে, তিনি বলবেন যে শিল্প কিন্তু প্রাথমিক রূপাকার নয়, অন্তত মানুষের কাছে। মানুষের কাছে শিল্প প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের রসায়িত আকারের রূপায়ণ, দর্শনের বা স্মৃতির দৃশ্যের রূপান্তর বা নির্মাণ—অর্থাৎ মানবিক, সামাজিক। তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর মৌলিক বস্তুপরিচয় অস্বীকার করেন না। পাবলো পিকাসোর মননী নেতিবাদ বা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় সব সম্বন্ধপাত ভেঙে যায়। পশ্চিম ইওরোপের বুর্জোয়া বিকাশের অন্তিম ক্ষণে সেটাই সংগত, পুনর্নির্মাণের, পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে। এদেশে বুর্জোয়া যুগ আরম্ভে অপ্রকৃত ও বিকাশে অসম্পূর্ণ। গ্লানি তাই বিস্তর, পুনর্নির্মাণে লাভ শুধু দ্রুত-মুমূর্ষু লোকসংস্কৃতির বিড়ম্বিত ঐতিহ্যের অবশিষ্ট সুযোগটুকু।

যামিনী রায় সেই ক্ষীণ সুযোগ তাঁর শিল্প-সাধনায় সার্থক করেছেন। আমাদের শিল্পীদের মধ্যে ইওরোপকে চিত্রে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁরই সমধিক, এবং তিনিই বুঝেছেন আমাদের দুশো বছরের মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া যুগের প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা। এইখানেই তাঁর ক্ষমতার উৎস এবং হয়তো এই-খানেই অসম্পূর্ণতার দোটানায় কিছুটা বা তাঁর অতীতের স্বপ্নাতর্তি ও তাঁর ইউটোপিয়া। নিজের সাধনার একক ও প্রবল তীব্রতায় তিনি হয়তো

ক্লাইভ হেস্টিংস ডালহৌসি থেকে কংগ্রেস অবধি, রামমোহন থেকে বাংলা
প্রগতিতাত্ত্বিক অবধি যে নববাবুবিলাস তাকে একটু বেশি অস্বীকার করেছেন
ভাঙা-সেতুর প্রশ্নটা বড় করেন নি, মানেন নি ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে
বেলিন্‌স্কি একবার বলেছিলেন যে রুশ মহাকবি পুশকিন অর্ধেকটা জাতী
কবি। কথাটা তখন সত্যই ছিল, আজকেই শুধু দেশের মানুষের সামগ্রিকতা
জাতির অখণ্ডতায় রুশদেশের সেই পুশকিনকেই বলা যায় জাতীয় কবি
রুশ বুর্জোয়ার তুলনায় বাংলার অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া আরও বিচ্ছিন্ন, তাই রবীন্দ্র
নাথের বিরাট সার্বভৌমত্ব আজো ইতিহাসের ভবিষ্যতে নিহিত, কর্মের ভাবি
সিদ্ধির পটে সম্ভাবনায়। রুশদেশে রোমান্টিক বিদ্রোহী পুশকিনের চেয়ে
কথাটা মাউন্টব্যাটেনপ্যাটেল যুগে এখানে আমাদের পক্ষে আরো কঠিনভা
সত্য—রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিদ্রোহী যদিচ আস্তিক প্রতিভার অসামা
ব্যাপ্তি সত্ত্বেও।

সম্ভবত মহৎ শিল্পীর আবশ্যিক একাগ্রতায় এই সমাধানের জটিলতা
প্রশ্নে ঝোঁক কম পড়ে। সে যাই হোক, যামিনী রায়ের এইসব চাষী মজু
বাউল ফকির, লালপাখি হাতে নীল চাষার ছেলে, কামার, লাঠি হাতে ব
টোকা মাথায় কৃষক, গৃহস্থ, বৃদ্ধা প্রবীণ ও নবীন, কুমারী ও বিবাহিতা মেয়ের
মায়েরা—এরা সবাই দেশের চেনা মানুষ, যামিনী রায়ের দীর্ঘ পরিচয়ে
মাধ্যমে প্রত্যক্ষের মমতার শুদ্ধ রূপান্তর। এবং এসব ছবিতে রঙের সে
প্রয়োগ যাতে চোখ পটের উপরে ঘুরে মরে না বস্তুর গোটা রূপের সন্ধানে
ভ্রাম্যমাণ যোগবিয়োগে। যামিনী রায় এই সিদ্ধি অর্জেছেন তাঁর বৈচিত্র্যে
সীমায়নে এবং বিশেষ করে প্রাণময় রেখাগুলির মধ্যে রংগুলির সমলেপ চা
এবং পারস্পরিক সংগতিতে; তার দ্বারা তাঁর ছবি একটা সামগ্রিক সাযুজ
লাভ করে, এমন একটা সত্তা যা স্পষ্টত ন্যস্ত এবং চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎবোধ্য
সান্ধ্য আলোকছটায় প্রশান্ত স্বচ্ছ সীমাসংহত একটা সমগ্র নিসর্গদৃশ্যে
মতো।

এই একদৃষ্টিভাত রূপ যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ অবশ্যই মূলত তাঁ
রীতিবিন্যস্ত রিয়ালিসম্ বা বাস্তবিকতা, যা তিনি অর্জন করেছেন প্রাকৃত
বাদের বা সাংবাদিকতার বিসর্জনে, সম্ভব হয়েছে কারণ তাঁর ছবিতে প্রতি
অংশ প্রাণ পায় প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতিসংস্থানে, মামুলি চিত্রের ভারসাম্যে
বা বাদপ্রতিবাদের জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক কৌশলের রসাভাসে ততটা ন

যতটা সমগ্রোৎসারী সক্রিয় অঙ্গাঙ্গিতায়, রঙেরই স্বকীয় গুণের সচল সম্বন্ধ-পাতে, যা তাঁর অনবদ্য রেখাকর্তৃত্বের সঙ্গে হাতবাঁধা।

প্রাচ্যশিল্পে এই রং ব্যবহার খুব প্রচলিত রীতি নয়। ভারতীয় চিত্রে এ আমরা কদাচিৎ দেখি, কিছুটা হয়তো বাশোলীচিত্রে এবং কিছুটা অজন্তায়। কিন্তু অজন্তা ভারতশিল্পে একটা দুর্লভ এবং অসাধারণ কীর্তি; অজন্তা, বলা যায়, স্থাপত্যচিত্র। তাছাড়া অজন্তায় পাওয়া যায় তার পরিমাণ বা আকার সত্বেও মধ্যযুগের পুঁথি সচিত্রকরণের গাল্পিক চলমানতা। যামিনী রায়ের ছবি যেন স্থানসন্ততিতে কাটা কাটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসা স্নায়ুতে গাঁথা মানুষের রূপ। তাছাড়া অজন্তার ওস্তাদদের পাথরের গায়ে যে উপরভাসা বর্ণাভাস আনতে হয়েছিল তাও তাঁকে আনতে হয় নি।

যামিনী রায় যেসব নানারকম টেকনিক প্রয়োগ করেন বা তিনি কিভাবে টেম্পেরা বা তেলরং তৈরি করেন সেসব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে আপাত-বর্ণলয়হীন টেম্পেরা রঙে তৈলচিত্রের ভাস্বরতা ও গভীরতা আনবার অপূর্ব নৈপুণ্যে, যাঁরা তাঁর রেলওয়ে লাইনের বা বাগবাজারের গলি বা বাঁকুড়ার বাড়ি বা দক্ষিণেশ্বরের ছবি দেখেছেন তাঁরাই অবাক না হয়ে পারেন না। এবং এ প্রসঙ্গে সচরাচর অবহেলিত জমি তৈরির প্রয়োজনীয় কাজেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। রঙের ও কাপড়ের বা কাঠের বা বোর্ডের এই বিজ্ঞান তাঁর নখদর্পণে বলেই তাঁর নৈসর্গিক ছবিগুলি এত আশ্চর্য সুন্দর। তিনি অবশ্য এগুলিকে তাঁর খেলা বা ব্যায়াম মনে করেন, যদিচ যে-কোনো ইংরেজ চিত্রকর এরকম কৃতিত্বে খুশিই হতেন।

এ ছাড়াও যামিনী রায়ের বহু ছবি আছে: গরু, ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, হাতি—দীপ্তবর্ণ; শিশুর মতো সরল কিন্তু যে নিশ্চিত সরলতা চরম বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীরই আয়ত্তে। তাঁর বাইবেল-পুরাণঘটিত ছবিতে এই কুশলীপনার সর্বপটীয়সী প্রতিভা স্পষ্ট। খৃষ্টঘটিত এই চিত্রগুলিতে তাঁর বৈষ্ণব চিত্রেরই কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা, আবার বাইজানটীয় ও রুশ আইকনের সমতুল্য তীব্র আততিও তাতে মেলে।

বাগবাজারের নোংরা গলিতে তাঁর বাড়িতে যাওয়া একটা আনন্দের উৎসব ছিল। এখন তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে যাওয়াও আনন্দের ব্যাপার, আমাদের ভবিষ্যতের সুখীজগতের শান্তিময় একটা সপ্তবর্ণ আভাস।

যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি, তাই নয়,

আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনোজগৎকেও রূপ দিয়েছেন—দৃশ্যপথে। এবং এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময়; তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মাতিসের কথায় এই অক্ষম পরিচিতির আরম্ভ, তাই দিয়ে শেষ করি। লুই আরাগঁ বলেছেন, মাতিস হচ্ছেন এ শতকের ফ্রান্সের তথা সুখের বা আনন্দেরই চিত্রকর। এক শতাব্দী ধরে এই আনন্দ নাকি ইওরোপে একটা নতুন ধারণা। একশো বছরে নাকি এই তারাটি আজ (১৯৪৮) মানব-আকাশে ধ্রুব হয়ে উঠেছে। এবং মাতিসের চিত্রাবলী নিশ্চয়ই এই আনন্দের যুক্তি ও প্রবল সমর্থন। মনে হতে পারে চিত্রিত বা কল্পিত এই আনন্দের ধ্যানে দর্শনে আনন্দের জন্য লড়াই থেকে লোকে নিরুদ্ধ হবে, আরাগঁ কিন্তু তা অস্বীকার করেন। তাই তিনি মাতিসকে মনে করেন সাং'র-মার্কা জয়ের যন্ত্র, মনে করেন অতীতের জীর্ণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, আজকের আনন্দে কর্মিষ্ঠ মিছিলে মাতিস যেন একটা বিরাট নিশান।

যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙিন আনন্দের চিত্রলোক আমাদেরও যেন সেই নিশান নির্দেশে সমৃদ্ধ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায়, গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়। মাতিস বলেছিলেন, শ্রমকাতর লোককে বিশ্রামের শান্তি দিতে চাই। যামিনী রায় চান ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ প্রতিবাদে ভেঙে গড়ারই পরোক্ষ প্রেরণা।

যামিনী রায় ও শিল্পবিচার

শ্রীমান অশোক মিত্র আমার একান্ত স্নেহভাজন ও দীর্ঘকালের বন্ধু, তাঁর পশ্চিমবঙ্গ শুমারির বিপুল কীর্তিতে আমিও অনেকের মতো মুগ্ধ এবং গর্বিত। শিল্পকলা সম্বন্ধে শ্রীমানের নানা রচনাও আমাকে বিস্মিত করেছে তাঁর অনলস উৎসাহ ও পাণ্ডিত্যের আরেক প্রমাণে। তাই শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ের বিষয়ে 'পরিচয়' পত্রে অশোকের দীর্ঘ আলোচনা পড়ে আমার মনে যে-সব প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলি তাঁর কাছে বিনা সংকোচে উপস্থিত করতে পারছি এবং যেহেতু আমার প্রশ্ন একজন সাধারণ বাঙালি মানুষের প্রশ্ন, যে-মানুষ যামিনী রায়ের ছবি ভালোবাসে এবং বহুকাল ধরে নিয়মিত আনন্দে দেখে আসছে, তাই এই প্রশ্নগুলির সার্থকতা ব্যক্তিগত সমাধানের ব্যাপারের বাইরেও গণ্য অর্থাৎ প্রকাশ্য হতে পারে।

'যামিনী রায়' প্রবন্ধের সুর অশোকবাবু তাঁর প্রথম দুই প্যারাগ্রাফেই বেঁধে দিয়েছেন ; বলেছেন : সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতোই, যামিনী রায় গড়ে দিয়েছেন আমাদের চিত্রশিল্পের ধ্যানধারণা। যার ফলে তিনি 'স্বদেশে স্বীকৃত' এবং সবদেশের শিল্পী ও সমঝদারের মনোযোগের পাত্র। তারপরে পাই তৃতীয় প্যারাগ্রাফে যামিনী রায়ের বিশেষত্বের বেশ সহজ ব্যাখ্যা। চতুর্থ প্যারায় অশোকবাবু বলেন, এই সবকটি বিশেষত্বই বাঙালি ঐতিহ্য, আবার এ-সবকটিই ভারতীয় ঐতিহ্য, আবার এ-সবকটিই বর্তমান পৃথিবীর, বিশেষ করে পশ্চিমের অম্বিষ্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তার ফলে অত্যন্ত আধুনিক। ব্যাপারটা কঠিন, তবে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছু-একটা বোঝা যায়।

কিন্তু তারপরে মাঝে মাঝে এমন-সব উক্তি আসে যাতে যামিনী রায়ের চিত্রকলার স্বরূপ বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়। ছাত্র যামিনী রায় বোর্ড-কাটা ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে ছবির পরিধি বা সংস্থান দেখে ছবির দৃশ্য বিষয় নির্দিষ্ট করছিলেন। এবং মাস্টার ব্রাউন শাহেব তাঁকে তারিফ করলেন — এর মধ্যে যে একটা বড় সত্য লুকিয়ে আছে, এর কাহিনীটি লিখতে ভুল

করলেও সেটা অশোকবাবু ঠিক ধরেছেন। কিন্তু সেটি শিল্পদৃষ্টির বড় সত্য। অশোকবাবু যে বলেছেন, এর ফলে 'যামিনী রায় কলকাত্তাই হবার লোভে সেই যে বাগবাজারের গলির বাড়িতে ঢুকলেন' — এ-কথায় সে সত্যটি নেই। কারণ ছবিমাত্রেই দৃশ্যবস্তুর পুনর্নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃসংগঠন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ দৃষ্টির নির্দেশে, দৃশ্যবস্তুর সীমায়নে, পরিধিকে ফ্রেমে ফেলায়, বাছাই করায়। 'কলকাত্তাই' হবার সঙ্গে এর সত্যতার সম্বন্ধ নেই, যদিও মানতে হবে ছাত্র যামিনী রায় সেই সেকালেই শিল্পের এই সত্য বুঝেছিলেন নিজেরই শিল্প-জিজ্ঞাসায়। এবং মানতে হবে যে যামিনী রায়ের কলকাতায় আসা, আর নানা রকম কাজ করে কষ্টে ছাত্রজীবনযাত্রার মধ্যে দৈনিক বীরত্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

এই হালকা অত্যুক্তির ঝোঁকে বা পরিহাসপ্রবণতাতেই বোধহয় লেখকের ভুল হয়ে গেছে যামিনী রায়ের ল্যাণ্ডস্কেপের হিসাবনিকাশে, তিনি লিখেছেন: 'তাই তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপে ঝড়জল নেই, অগ্নিদগ্ধ দিন, এমনকি দিগন্তবিস্তৃত মাঠও নেই।' এ কথা সত্য যে যামিনী রায় নিজে তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপগুলির সমধিক চিত্রমূল্য দেন না, কিন্তু সেখানেও তাঁর চোখের দেখা-চেনা, স্মৃতিজাত, কাল্পনিক বা বিদেশী কাজের পরীক্ষামূলক নানান্ ল্যাণ্ডস্কেপের বৈচিত্র্যে ও অসামান্য দক্ষতায় অবাক হতে হয়। আমি অন্তত কিছুতেই ভুলতে পারি না সংখ্যায় শতাধিক সেইসব বহির্দৃশ্যচিত্র — বাঁকুড়ার দিগন্তবিস্তৃত ঊষর মাঠ, সাঁওতাল-দেশের পাথর-মাটির ঢেউ, ধানখেতে লাঙল-চাষী, থৈথৈ বাদল-জলে মেয়েদের বীজরোপণ, রৌদ্রে ঝকঝকে বৃক্ষছায়াঘন মাঠপথবাড়ি, আলোছায়ায় প্রতীক্ষারত বস্তির ছবি, একাধিক অসুস্থ কলকাতার বিষণ্ণ বাড়িতে বাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষি গলি; বাগবাজারের গঙ্গায় বোঝাই নৌকা, টিনের শেড আর মেঘবিদ্যুতের ঘনঘটা বা আলোর দীপ্তি, টলোমলো জলধারা, নৌকায় পার্থিব কিন্তু অসীমে উধাও রহস্যময় জলরাশি, কাশীপুরের দোতলা বাড়ি, বেলেতোড়ের বা যে-কোনো মফস্বলের বাংলো বা কুঠি, পাহাড় রেললাইনে স্টেশনের দুরন্ত বাঁক, দক্ষিণেশ্বরের বটগাছ, সুস্থ শহরের আদর্শ বীথি ও বাসাবাড়ি — কত বলা যায়। ছবিমাত্রেই তো এক-টুকরো রঙিন কাপড়, বা কাঠ বা বোর্ড, এবং যামিনী রায়ের ছবিও অবশ্য তাই। কিন্তু যামিনী রায়ের বহুবিচিত্র এই ছবিগুলি অশোকবাবু যথোচিত মনোযোগ দিয়ে দেখেন নি বলে তাঁর জন্য আমি দুঃখিত। না হলে ঐ রঙিন কাপড়ের টুকরোর কথা বলে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন না।

তিনি বোধহয় যামিনী রায়ের প্রথাসিদ্ধ তৈলরীতির পোর্ট্রেটগুলির কিছুও মন দিয়ে দেখেন নি, তা হলে তিনি অবনীন্দ্রনাথের জলরঙিন প্রতিভার আলো-আঁধারী লীলার সঙ্গে সেগুলিকে ফেলতেন না। বাস্তবিক পক্ষে, এই তৈলাঙ্কিত পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে অনেক ছবিই আছে যার নৈপুণ্য ভারতে তুলনাহীন এবং যামিনী রায় নিজে সেগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর কাজ বললেও অন্যের মুখে সে কথার পুনরুক্তি ভ্রান্তিকর। তারপরে তিনি অবশ্য আবার চমৎকার শ্রদ্ধার সঙ্গেই লিখেছেন যামিনী রায়ের পরিণত যৌবনের শিল্প-সমস্যার ও সমাধানের অনেক কথা।

কিন্তু এগারো প্যারাগ্রাফে অশোকবাবু আবার বিমূঢ় করে দেন ইওরোপীয় চিত্রের সংজ্ঞানির্দেশে ভিনিসীয় শিল্পী, এল গ্রেকো, রেমব্রাণ্ট, কুর্বে ও দেলাক্রোয়া-র নাম এক নিশ্বাসে গেঁথে। ভিনিসীয় শিল্পীরা কি সব এক? এঁরা কী হিসাবে সবাই এক ধরনের শিল্পী, এক শিল্পসমস্যায় ভাবিত এবং জিজ্ঞাসায় পরীক্ষারত? সে কি, লেখক যাকে বলেছেন প্লাস্টিক প্রতিমা, তারই পরীক্ষা? তা হলে ঐ কটি বিশেষ নামের পরম্পরার তাৎপর্য কী? আর ঐ প্ল্যাস্টিক প্রতিমা জিনিসটি ঠিক কী? সে কি, লেখকের ভাষায়, রঙের সবকিছু গুণ নিংড়ে বার করা, যার চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে প্রাচ্য অলংকারাত্মক ডেকরেটিভ চিত্রে? অলংকারাত্মক ডেকরেটিভ চিত্রের ঝোঁক কী করে প্ল্যাস্টিক বা স্পৃশ্যপেশলতাময় প্রতিমার ঝোঁক হবে? এইটিই কি আমরা পাই বারো প্যারার সেজানের সাধনায়, এক নতুন শিল্পরীতিতে যিনি প্রথম প্রিমিটিভ? কিন্তু তা হলে এই রঙ নিংড়ে প্রতিমারূপায়ণের সাধনাকে আবার দু-ধারায় লেখক ভাগ করেন কেন? পিকাসো বা ব্রাক্ এবং তারই সঙ্গে দেরঁ্যার চিত্রকে কোনোমতেই কি বর্ণগৌণ বা বিবর্ণরূপপ্রধান বলা যায়? তেমনি মাতিস্ বা দুফি-কে সেজানের ধারায় বর্ণসংকর সন্তান না বলে বরং সেজান্-পূর্ব ইম্প্রেশনিস্টদের এবং প্রাচীন ও আদিম মানুষের এবং এশিয়া আফ্রিকার বর্ণরেখারূপের শিল্পরীতির সার্থক উত্তরাধিকারী বললে আরো সংগত হত না? অশোকবাবু নিজেই প্রায় তা বলেছেন, কিন্তু সেটা ১৫ প্যারাগ্রাফে।

অশোকবাবু যদি এক সেজান্ বিষয়েই আরো ধৈর্য ধরে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে আরো বেশি সময় ধ্যানধারণায় ব্যয় করতেন, তা হলে তিনি শিল্পের প্রেরণা কি জাতের হয়, আধুনিক শিল্পীর কি সাধ ও সাধ্য, কি তার গৌরব

ও তার প্রায় অসম্ভবের অম্বিষ্ট কি, সে বিষয়ে আমাদেরও আরো স্বচ্ছ কিন্তু দায়িত্বসম্পন্নভাবে বোঝাতে পারতেন। তা হলে তাঁর মনে থাকত যে যামিনী রায় বা যে-কোনো সৎ শিল্পী তাঁর নিজের মানসের তাগিদে, স্বভাবের অখণ্ড প্রেরণাতেই কাজ করেন, কিছু ছাড়েন, কিছু গ্রহণ করেন—পরীক্ষা করে চলেন। তাই তো সৎ শিল্পী লঘু মুহূর্তে খেলায় বা বিনোদনেও যা করেন তা একটা বৃহত্তর ঐক্যের প্রবাহে নিজের স্থান করে নেয়। এ মন তথাকথিত রম্যরচনার বিচ্ছিন্ন মন নয়, এবং এতে শিল্পীকে জনসাধারণ বা বালক বা কিশোর ইত্যাদি মনগড়া পাঠকশ্রেণী বা দর্শকশ্রেণী খাড়া করে নিজেকে এবং দর্শককে বিডম্বিত করতেও হয না। শিল্পীর যন্ত্রণাময় আকুতি এবং কৃচ্ছ্রসাধনের এই বড সত্যটা মনে রাখলে শিল্পকর্ম গ্রহণ করা সহজ হয, তা হলে আর লেখক ১৬ প্যারায যামিনী রায়কে 'স্বদেশের দরজায় ধর্না দিয়ে' বসাতেন না। বস্তুত কোনো শিল্পী কারো দরজাতেই ধর্না দেন না, নিজের চোখ মাথা হাত ছাডা। যামিনী রাযের বিষযে ভাবতে গেলে ভ্যান্ গগের কথাটা তাই স্মরণীয: 'আমাদের জীবনযাত্রা প্রায় মঠের ব্রহ্মচারী বা গুহাবাসী তপস্বীর মতো, আমাদের মন্ত্র শুধু কাজ, সব সুখ আরাম ত্যাগ করে।' এ-রকম শিল্পীকে কখনো কখনো পরিব্রজব্রতও নিতে হয় নিজের শিল্পপ্রেরণারই তাগিদে, নিজের সাধনার ও সিদ্ধির অসম্পূর্ণতার ও অতৃপ্তি-করতার ক্রমিক উত্তরণের বোধ থেকেই। কাজেই ইওরোপের খবর যামিনী রায়ের কাছে কবে এল বা এল কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। যে-কোনো শিল্পীর বিচারে বাইরের লোককে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়, পাছে অবান্তর অবজ্ঞার লেশমাত্র এসে পৃষ্টপোষণের আভাসে বিচারটাকে গৌণ করে দেয়।

আসলে বোধহয় অশোকবাবু একটা বিশেষ ইওরোপকে মান স্থির করেই এই বিভ্রমের পাকে থেকে থেকে পা দিয়ে ফেলেন। কারণ ইওরোপ মূলে আমাদের তুল্যমাত্র, সমান নয়। তা ছাডা ইওরোপ বলতে শুধু কয়েকশো বছরের পোশাকী পশ্চিম ইওরোপ ভাবাও মূলের সন্ধানে ভ্রান্তিকর। অথচ গির্জা ও দরবারের বাইরেও শিল্পের উৎস খুঁজে যেতে হবে এবং দ্বিতীয় বা পূর্ণ রেনেসান্সের আগে অর্থাৎ বুর্জোআ বিকাশের আগে আর আবার তার পরে ; না হলে ইওরোপের সস্তা টুরিস্টের ইওরোপেই নিঃশেষ, না হলে আধুনিক শিল্পের শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও,

বোঝা যাবে না সেজানের মতো শিল্পীর কী অন্বিষ্ট, কী সাধ্যের সীমা, সাধনার স্বরূপ ও তাঁর সিদ্ধি।

প্রকৃতির বিশেষ বস্তুরূপ ও শিল্পীর বিশেষ মানসের ছাপে মৌল-রূপের যে পুনঃসৃষ্টি আকারে ও বর্ণের শুদ্ধ একাগ্রতায়, তার ইতিহাস বুঝতে গেলে যেতে হয় ইতিহাসের প্রাচীন কাল অবধি, হাতে নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা। সেজানের মেজাজ বরং একদিক থেকে বলা যায় দ্বিতীয় রেনেসান্সের আগের মেজাজে দোসর খোঁজে, যে মেজাজে ত্রুবাদুর কাব্য, ডান্স স্কোটাস ও রজর বেকনের জিজ্ঞাসা, বাইজান্টীয় ও সর্ব-ইওরোপীয় আলোকময় শিল্প, শুদ্ধ মোডের সংগীত। যে মেজাজে অ্যাকোআইনাস চেয়েছিলেন রঙের স্পষ্ট সাকার ঔজ্জ্বল্য, যে মেজাজে বুর্জোআ-দুঃস্থ সেজানের মনে হয়েছিল যে তাঁর কাজ প্রকৃতিকে পুনর্জাত করা নয়, প্রকৃতিকে পুনঃপ্রতিভাত করা, এবং তা রূপসত্তায় এতই ভালোভাবে করা, যে সেজানের সংহতরূপ আপেল আর খাদ্যই থাকে না। তিনি বস্তুর সন্নিহিত রূপ চান, যে-রূপ শিল্পীর মানসের চাপে যেন হাতের আঘাতে আঘাতে বেরিয়ে আসে, যা তৈরি করা নয়, জোড়া নয়। অবশ্যই তিনি চিত্রশিল্পী, তিনি তা করেছেন চিত্রের মাধ্যমে, আকার ও বর্ণের অখণ্ড ভাস্বরতায় ঘনতার সম্বন্ধপাতে। নিছক প্ল্যাস্টিক বা সংযোজক গঠনের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, তাই তো আলোকবিকিরণে মানুষ বা আপেল, জলাধার বা পাহাড় বা গাছের সবকিছুর স্বকীয় দেহ-বিচ্ছুরিত ভাস্বরতায় ও স্পষ্টতার মধ্যে তাঁর আকার ও রঙ হয় বস্তুর সব মৌলরূপে, প্রায় জ্যামিতিক রূপে ধৃত। সেজান প্রকৃতির বস্তুরূপে একটা অতিস্পষ্টতা আরোপিত করেন বস্তুর সমতলগুলিকে অতিরঞ্জিত করে তুলে। তিনি অবশ্য ধ্রুপদী কন্‌টুর বা দেহরেখাকে প্রাধান্য দিলেও তাঁর কালধর্মের প্রয়োজন অনুসারেই ঠুম্‌রির স্থানীয় রঙ একেবারে ছাড়তে চান নি, যা ছাড়লেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা। একই কারণে সেজান্ টোনের ক্রমিকতাও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। কারণ তাঁর কালে, তাঁর সমাজে অগ্রগণ্য শিল্পচিন্তাতেও সেটা স্বাভাবিক ছিল, তখনও তাঁকে ভাবতে হয় নি বহিঃপ্রকৃতির রূপে দ্রষ্টা-মানুষের কর্তৃত্ব কতখানি। প্রকৃতির সামনে সেজানের মনে স্বচ্ছতা আসত, কিন্তু প্রকৃতি তখনো ওঅর্ডসওঅর্থের ইঙ্গিত সত্ত্বেও, উনিশ শতকের বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক প্রকৃতি। অথচ সেজান বুঝেছিলেন এই প্রকৃতির অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা। তাই তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতিতে স্থায়িত্বের

রোমাঞ্চ দিতে, কিন্তু তার চঞ্চল মায়াও তিনি একেবারে ছাড়ার কথা ভাবতে পারেন নি। পরের শিল্পীদের, পিকাসোদের পক্ষেই সম্ভব হল, প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা প্রতিকৃতি আঁকা নয়, প্রকৃতিকে বদলে দেওয়া। কিন্তু সেজান্ বস্তুরূপগুলির প্রান্তসীমার সবল গণ্ডিরেখা বা পরিণাহ এনে তাঁর বর্ণসম্বন্ধের ঘরে ঐশ্বর্য আনলেন, কারণ রঙিন রূপে গাঢতর রেখার বা পাড়ের বাঁধনে রঙ আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, রূপ আরো স্পষ্ট।

অবশ্য নিছক রঙের রূপের এই অর্ন্তনাবাশ্বর শিল্পের অধরা আততি কিছুতেই শেষ হয় না, সৎ নিরাসক্ত শিল্পীর যন্ত্রণাও তাই অশেষ। এর ফলে সমান কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাগগুলিকে ঘনতায় নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, যেন প্রায় মোজেইক-কাজের মতো। আগে বারোক্ চিত্রকলাতেও এ-রকম সমস্যা দেখা গেছে। সেখানে কিন্তু কোনাকুনি টানে এর সমাধানচেষ্টা। এর আরেক সমাধান দেখি পিকাসোর মতো আধুনিক শিল্পীর ছবিতে, যেখানে সবকটি চড়া রঙ সমান ও এক সময়ে গেয়ে ওঠে, কেল ভিন্ন বা কেউ আগে-পরে নয়। যামিনী রায়ের স্বকীয় রীতিবিন্যস্ত ছবিতেও দেখি এই বর্ণপরম্পরার সমতলিক ঐক্য। এই যে সাকার রঙের পারস্পরিক যোগ-বিযোগের ঐক্য, এ অতি প্রাচীন শিল্পরীতিতেও পাওয়া যায়, এমনকি আদিম গুহাচিত্রেও। আবার পাওয়া যায় সমস্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাসে সজ্ঞান আধুনিক শিল্পীর আতত কাজে এবং এইসব চিত্ররচনায সংহতির উৎস সা-তেও নয় রে-তেও নয়, সমগ্র স্বরলহরিতে —অর্থাৎ সমগ্র চিত্রায়ণেই, রেখা ও রঙের অখণ্ডতায়। এই সমগ্রতাকে উপযুক্ত কথার অভাবে আমরা কখনো বলি কম্পোজিশন, কখনো- বা ডিজাইন বা প্যাটার্ন। চোখ কিন্তু ভাষার চেয়েও ক্ষিপ্র এবং নিমেষে ধরতে পারে। আমাদের অনেকের আজ এই সংহতিতে এই শুদ্ধ সমগ্রতাতেই আনন্দ, তাই আধুনিক চিত্রকলা আমাদের বিচলিত করে সাক্ষাৎ আবেদনে, তাই তো দ্বিতীয় রেনেসান্সের চেয়ে প্রথম রেনেসান্সের অখ্যাত শিল্পীর কাজ বেশি মর্মে লাগে, তাই তো আধুনিক শিল্পের অন্বেষায় অজন্তার কৃতিত্ব গৌণ মনে হয়, পারসীক রাজপুত মুঘল দরবারীর চেয়ে বাংলা ওড়িয়া গুজরাটি পট-পাটার ছবি বেশি তৃপ্তি দেয়।

অশোকবাবু চিত্রকলার মান নিয়েছেন ১৬ থেকে ১৯ শতকের ইওরোপের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপ্রধান যথাযথবাদী পোশাকী শিল্পরীতির চলতি ধারণা থেকে। তাতে স্থানকালপাত্র-বিবেচনা গৌণ হয়ে পড়ে এবং এই তুলনার প্রচ্ছন্ন অভ্যাস

আমাদের মতো সাধারণ চিত্রোৎসাহী মানুষকে বিপথে ঘোরায়। তাই তো অশোকবাবুও যামিনী রায়ের ছবিতে কাংড়ার মেজাজ খুঁজে পেয়ে হয়রান হন। আবার তিনি ভিনিসীয়দের স্বরগ্রামযুক্ত বর্ণাঢ্যতা না পেয়ে যামিনী রায়ের এক যুগের ছবিতে রঙের ডিসোনান্স বা বিরোধ খোজেন, অথচ ছবিতে রঙের পিগমেণ্টের বর্ণাভাসে কমপ্লিমেণ্টরির চড়া বিবাদী সংগতি বা প্রায়-কমপ্লিমেণ্টরির বিস্মিত সুষমাই শিল্পীর সন্ধান। কারণ আধুনিক শিল্পী লোকল্ বা স্থানীয় রঙ-মাহাত্ম্য মানতেই পারেন না, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ণরেখায় বস্তুর অখণ্ডতার রূপ দেওয়া তাঁর ছবিতে। তা ছাড়া সত্যই তো প্রকৃতিতে স্বয়ংস্বাধীন স্থানিক রঙ বলে কিছু নেই, ওটা ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যনির্মাতা ইওরোপের ভেদবুদ্ধিগত দেখার একটা মালিকানা অভ্যাস মাত্র। প্রকৃতির সংজ্ঞা আজ উনিশ শতকের আধিদৈবিক বা অমানুষিক দর্শনের তত্ত্ব নয়, আজ দ্রষ্টা ও দৃশ্য আপন নির্দিষ্ট সীমায় আরো সজীব ও কর্মিষ্ঠ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ। তাইতো পিকাসো বলতে পারেন : 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বলে কিছু নেই, বস্তু থেকেই সব আরম্ভ।' বা বলেন : 'আমি যা দেখি তা-ই আঁকি।'

বস্তুর গাত্র বা স্থানীয় বর্ণ বস্তুতে আলোকসম্পাতেরই স্থানবিশিষ্ট প্রকাশ, যা দেখা যায় শুধু কাছের খণ্ডিত দৃষ্টিতে। তাই মাতিস বলেন : 'আমার কাছে শিল্পরূপ একটি মুখের বিচ্ছুরিত বা একটি প্রবল ভঙ্গিতে প্রকাশিত ভাবাবেগে নেই, আমার শিল্পাবেগ আসে আমার ছবিটির সমগ্র বিন্যাসে—এতে মূর্তিগুলির সংস্থান, তাদের আশেপাশের খালি স্থান, পরস্পরের সামঞ্জস্য—সবকিছুই যে যার কাজ করে যায়।' আধুনিক শিল্পী তাই এই স্থানীয় রঙের জের বাদ দেন বা রূপান্তরিত করে দেন পরিপূরক বা প্রায়-পরিপূরক বর্ণমালার সমগ্রতায়। আবহবর্ণের ব্যবহারেও তাই হয়, যে বর্ণাভাসে দূরের পাহাড় আকাশের রঙে বাঁধা পড়ে হয়ে ওঠে ঘননীল বা সবুজনীল। আলোকদ্যুতি বা প্রতিফলিত বর্ণ, যার আভাসে সান্ধ্য আলোয় শুভ্রশৃঙ্গ হয়ে যায় কষিত-লাল, সেও তাই আধুনিক চিত্রকরের বর্ণপ্রয়োগে সমগ্রতার প্রতিক্রিয়ায় নতুন বৈশিষ্ট্য পায়। গোগ্যাঁর কথা মনে পড়ে : 'সর্বদা স্মৃতি থেকে এঁকো। রঙের প্রতিসাম্য নয়, সমস্বর খুঁজো। শুধু বিশ্রামের রূপ আঁকবে। সর্বদা গণ্ডিরেখা দেবে। খণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ অংশ নিয়ে ভাবিত হয়ো না। কখনো বিচ্ছিন্ন রঙ ব্যবহার করো না।'

প্রসঙ্গত, মনে রাখা ভালো যে তত্ত্বের বর্ণ এবং শিল্পীর ব্যবহার্য দ্রব্যবর্ণ সর্বদা সমমূল্য নয়। সিঞাকের কথা ভাবুন : লাল ও সবুজে হলদে হয়, কিন্তু ছবির আকাশে যদি লাল ও সবুজ বিন্দুসমষ্টি দেওয়া হয়, তা হলে ফলে দাঁড়ায় একটা বর্ণহীন ক্লৈব্য। কারণ হলদে ব্যবহার্য রঙ হিসাবে শুদ্ধ বা প্রাথমিক, যদিও আলোকের দিক থেকে মিশ্র, অর্থাৎ ছবিতে সাক্ষাৎ হলদে প্রলেপেই আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা সম্ভব। তা ছাড়া, শিল্পীর বর্ণবস্তুর কোনো স্বকীয় সার্থকতা বা দ্রব্যগুণ নেই, তার প্রাণ আসে শুধু সম্বন্ধপাতে, অন্য রঙের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি বাদ-প্রতিবাদে এবং সবটার আর প্রত্যেকের প্রভা নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক আলোকস্পন্দনের স্বরগ্রামের উপর। সেকালে অনেকের ধারণা ছিল যে নীলের বিবাদী কমলা, হলদের বেগনি। আজকাল শিল্পীরা জানেন যে চোখের নেতিবার্তিক প্রতিচ্ছবির নিয়মানুসারে নীলের পরিপূরক হচ্ছে হলদে, বেগনির পালটা সবুজ, লালের সমুদ্রশ্যাম, কমলার আকাশনীল বা ফিরোজা।

কিন্তু এইসব মূলবর্ণের নানান্ আভাস, এক হলদেই কত রকম হয়, তা ছাড়া এ-রঙে ও-রঙে মেলে, শাদার প্রভাবও আশ্চর্য। শিল্পীরা জৌলশও পালটান, কখনো মেরে দেন বা কখনো চড়া করেন বা কখনো 'গণ্ডিরেখার সাহায্যে রঙের পরদা ওঠান বা নামান। যামিনী রায়ের হাতে তাঁর পরীক্ষা-যুগের সব ছবিতেই টোন বা বস্তুর আকাডেমিক প্রথার খণ্ডবর্ণের রেশ গৌণ, কারণ ছবির ও তন্নিহিত বস্তুর বা বিষয়ের স্পষ্টতা ও সেইসঙ্গে বর্ণসমগ্রতাই তাঁর লক্ষ্য। অবাক হতে হয় তাঁর বৈচিত্র্যে, একদিকে বর্ণসমগ্রতার বিন্যাসের অফুরন্ত নবনব উদ্ভাবন আর অন্যদিকে চিত্রবস্তুর নিত্যনব ভিন্নভিন্ন রূপ বা থীম। তাই তো সেজান্ বলেছিলেন : যখন বর্ণিকাভঙ্গে বা রঙে আসে ঐশ্বর্য তখন রূপভেদে আসে সাকার পূর্ণতা।

এই বৈচিত্র্যের ইতিহাস বিষয়ে অশোকবাবু যথেষ্ট অবহিত নন, ফলে যামিনী রায়ের কাজের যে ইতিহাসটি তিনি দিয়েছেন তাতে শিল্পীর বিকাশের বা সন্ধানের তাৎপর্য ও পরম্পরাটি স্পষ্ট হয় নি। যামিনী রায়ের তৈলচিত্রপর্বটি তিনি প্রায় বাদই দিয়েছেন। পুরোপুরি প্রথাসিদ্ধ তৈলপ্রতি-কৃতি যামিনী রায় অনেক এঁকেছিলেন, তার বাস্তবতা ও নৈপুণ্য আজও ভারতে বিস্ময়ের বস্তু। এই প্রতিকৃতির অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল তাঁর কয়েকশত ফোটোগ্রাফিক চিত্রণে, নানা টাইপের মুখের জ্ঞান তাই তাঁর স্মৃতির মজ্জায়

মজ্জায়। যামিনী রায়ের ক্ষেত্রে সব অভিজ্ঞতাই কাজে লাগে। জীবিকার জন্য গরানহাটার এনগ্রেভিং-এ রঙ দেওয়ার কাজ, লিথো-ছাপা, ব্লক-প্রসেস, রঙের ছাপাখানার কাজ, ইহুদি ভদ্রলোকের কাজে পোস্টকার্ডে তিন আনায় শ হিসাবে রঙ দেওয়ার দু-বছরব্যাপী অভিজ্ঞতা—সবই তাঁর চোখের হাতের জ্ঞানে পরে সার্থক হয়ে উঠেছে। বিশ বছর ধরে বাংলা থিএটারের অভিজ্ঞতাও তাঁকে দূর থেকে মানুষের চেহারার গোটা রূপ ধরতে সাহায্য করছে, এমনকি কাপড়ের দোকানের অভিজ্ঞতায় তিনি নিশ্চিত হন ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন ও রঙের চাহিদার বিষয়ে।

তাই তাঁর প্রথম যুগের কাজ তাঁর পরের চিত্র-বিচারে নগণ্য নয়—তার নিজের উৎকর্ষ ছাড়াও। কিছু শরীরচিত্রও এই যুগে তিনি আঁকেন, ভাণ্ডারকর বা আবদুল আলির মতো দরদী শৌখিন ব্যক্তিদের জন্য। তারপর তিনি আঁকতে শুরু করেন তাঁর স্পষ্টতই পরীক্ষামূলক ছবি: সান্ধ্য আলোয় মৃতদেহ, তুলসীতলায় বাঙালি নারী, নমাজ-নিবিষ্ট পুরুষ, বংশীবাদক—ইত্যাদি। এগুলিতে, যাকে অশোক মিত্র বলেছেন মডেলিং বা প্ল্যাস্টিক গুণ, তা বর্তমান এবং রঙের আমেজও এগুলিতে বর্তমান, কারণ এতে রঙে টোন বা তানের বিলীয়মান রেশ আছে। তারপরে দেখি এই নিবাতনিষ্কম্প সান্ধ্যআলোর দ্বিধাহীন সুষমাই প্রাধান্য পায়, অর্থাৎ রঙের টোন বা আমেজ গৌণ হয়ে যায়, রঙের বৃহত্তর রূপায়ণ আসে একজাতের ছবিতে: সাঁওতাল মেয়ে চুল বাঁধছে বা চুলে ফুল সাজাচ্ছে বা নদীতে দাড়িয়ে জলে বেখে মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছে, মা ও ছেলে নত হয়ে প্রণাম করছে—ইত্যাদি অনেক ছবি। এরই আরো শুদ্ধ বর্ণরূপায়ণ দেখি বিধবা কৃশ মা-র হাতে ছেলে কিংবা বৃদ্ধ ষাঁড়—এ-সব ছবিতে বর্ণবিলাস যাঁর স্বভাবে গভীর তিনি রূপের তপস্যা মৌলিকতা খুঁজেছেন। তারপর রঙিন রেখার টানে রঙিন জমির সমলেপ ছবিগুলি। এইসব ছবিতে প্ল্যাস্টিক বা গ'ড়ে-গ'ড়ে-তোলা বর্ণ-যোজনার চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে সাকার রঙের সমতা এবং যেন খোদাই বা রূপনিষ্কাশিত মূর্তির বর্ণাভাস।

কিন্তু তবু রঙের ভাবাবেশ কেন যায় না? তোতাপুরীর নির্দেশে রাম-কৃষ্ণের সেই দেবীর সাকার ধ্যান বর্জন করার সঙ্গে তুলনীয়, সেজানের মতো পিকাসোর মতো যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের পূর্ণতার পথের এই প্রগতির যন্ত্রণা। যামিনী রায়ের একলব্য সাধনা তাঁকে নিয়ে গেল উপবাসীর তনু

সৌন্দর্যে, সর্ববর্ণের সার নীলকণ্ঠ শুভ্রতার আভাস ও কৃষ্ণধূসরিমার বিন্যাসে, তিনি আঁকলেন রেখার বলিষ্ঠ রূপবর্ণে চোখের ভিতরের নীলধূসরের আর বাইরের আকাশের ধূসর নীলিমার শতবন্তর প্রতিমা। কিন্তু শুদ্ধির এ তাপসী রূপ তাঁকে বাধল না, প্রশ্ন এল এই শুদ্ধি কি বর্ণকে উহ্য করার জন্যই? রঙের মর্ত্যসংসারেরও কি শুদ্ধি থাকবে না? তাই তারপরে তাঁর ছবিতে ফেটে পড়ল মৌলিক বর্ণের প্রখর ছটা।

আধুনিক কবিতায় যেমন, সংগীতে যেমন, আধুনিক ছবিতেও শিল্পকর্মের সার্থকতা আবেশের রেশে নয়, গল্পের জেরে নয়; তার লক্ষ্য বস্তুর জড়িত গলাগলি রূপ নয়, স্পষ্টবর্ণায়নেই শিল্পবস্তুতে রূপের স্পষ্টতা। আধুনিক বর্ণ-ব্যবহারে তাই প্রথাসিদ্ধ মেটের প্রাধান্য নেই; স্থানীয় বা অঙ্গনিবদ্ধ বর্ণফলের মিশ্রণ। যামিনী রায়ের এইসব ছবির রঙের ব্যাখ্যায় রঙগুলিকে ডিসোনাণ্ট বা বিবাদী বলায় কিছু বোঝা যায় না, কারণ এইসব ছবির স্পষ্ট রঙপ্রয়োগের পারস্পরিক বিন্যাসের অখণ্ডতাতেই গোটা ছবির সম্পূর্ণ ছবিত্ব। কম্‌প্লিমেণ্টরি বা পরিপূরণাপেক্ষী রঙের ব্যবহারেও তাই। এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে আপাত-বিবাদী বা সম্বাদী বর্ণব্যবহারে চিত্রে আসে স্পষ্টরূপ বা স্বাধীন একটা রূপ যা দক্ষ-শিল্পীর হাতে পায় অনিবার্য একটা সামগ্রিক বর্ণসুষমা বা সংগত রঙের আমেজ; সে আমেজ সারা ছবিটি জুড়ে, জীবন্ত মানুষের রূপের মতো, বা বলব, ব্যক্তিত্বের মতো বিশেষ।

অবশ্যই এ আমেজ তথাকথিত রেনেসান্স থেকে গতশতকের প্রথা-সিদ্ধ ইওরোপীয় চিত্রে যে-জড়িত টোনের বা স্বরভাঙা অনুবাদী মিশ্রণের লোভী আমেজ, তা নয়। তাই তো সেজানের আপেলে এতই বিশিষ্ট আপেলেরই প্রত্যক্ষ সত্তা যে সে-আপেলে আর লুব্ধ খাদ্যতা অবশিষ্ট নেই। একালের ধারণায় বস্তু বা ব্যক্তির সত্তা রঙ বা আলো বা খেয়ালের একতরফা আকস্মিকের উপরে নয়, নির্ভর করে সংহতির উপরে। একালের শিল্পী যেন প্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সেই পাখি, যে দেখত আর যার সঙ্গী খেত, আর এই দেখন-পাখির আনন্দই বেশি। ভাবা যায় আজ এমন দৃষ্টিও, যে দৃষ্টি ভালোও বাসে আবার দেখেও এবং যে দুয়ের বিরোধ সমন্বয় করে বস্তুকে বা অন্যকে সম্পূর্ণ সত্তার মর্যাদা দিয়েই, উভয়ত সচলস্বাধীন সম্বন্ধপাতের মধ্যে দিয়ে। একালের মানসে, এর সনদ মেলে মানবিক কারিটাসে প্রেমে, যেটা সোভিয়েত মানুষে ইতিমধ্যেই অনেকে লক্ষ্য করেছেন।

এ বিষয়ে অশোকবাবু নিশ্চিত না হওয়ায় এবং যামিনী রায়ের বিরাট চিত্ররাশির পরম্পরা বিষয়ে অন্যমনস্ক থাকায় তাঁর আলোচনাটি তাঁর চিন্তার গোলকধাঁধায় আমাদেরও ঘুরিয়েছে। শিল্পবিচারে বোধহয় নিজের এবং নিজের কালের রুচির কী প্রয়োজন সে বিষয়ে মনস্থির করাটা তাই প্রাথমিক। তাইতো পিকাসো বলেছিলেন যে অতীত-শিল্প বলে কিছু নেই, বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীত প্রাণ পায়।

এদিকে যামিনী রায়ের বৈষ্ণববিষয়াশ্রিত ছবি, রামায়ণের ছবির দুটি পালা, সঙ্গে সঙ্গে রেখাপ্রধান ছবির বিবর্তন চলল। তাঁর নিজের দেশী ঘরানায় বিদেশী পুরাণের রূপদানের সমস্যায় এল বাইবল-বিষয়ক ছবিগুলি, যেখানে পাপপুণ্যের লোকোত্তর বিশ্বাসের রূপ দিতে হবে ছবির চিরলোকায়ত মাধ্যমে, অতীন্দ্রিয় রূপকের ঘটনাকে রূপ দিতে হবে চাক্ষুষের গ্রাহ্যতায়। কিন্তু এ গম্ভীর স্নিগ্ধ ঘরোয়া কিন্তু অমর্ত্যের রূপায়ণের সাফল্যেই তো শেষ নয়। যামিনী রায়ের শিল্পে যন্ত্রণা আসে থেকে থেকে, পিকাসোর মতো তাঁরও শিল্পজীবন ফাঁড়ায় ফাঁড়ায় অস্থির অশান্ত। তাই বিশ্রামহীন দৈনন্দিন শিল্পকর্মে রত এই শান্ত বাঙালি শিল্পীকে দেখি তাঁর হাতের রেখার কৃতিত্বে ক্লান্ত হয়ে রেখার টানের ছবিতে এবারে পাথুরে জমির শারীরিকতার সন্ধানে ব্যস্ত। ভুসোর শাদার বিন্যাসে জমি আঁকার কঠিন রহস্যের দ্রুত আকস্মিকতায় ফুটে ওঠে এইসব মৃত্তিকাপ্লুত স্থির কিন্তু প্রাণময় মূর্তিগুলি। বা ফুটে ওঠে অধরা আবেগের সৌন্দর্যে গেরিমাটির তীব্র জমি আঁকার বিন্যাসে একক বা বহু মানুষের রূপের শুদ্ধস্বর। এদিকে আবার নিছক আলপনা-বিন্যাসে যামিনী রায় উত্তরোত্তর মন দেন, ফলে শুদ্ধ বা বিষয়ত্যাগী নকশার ছবিতে আসে রহস্যময় গভীর রূপাভাস।

খবরের কাগজে, চটে, ছেঁড়া কাপড়ে ছবি তো আগেই হয়েছে। এবারে যামিনী রায় তালপাতা নারকেলপাতা হাতের কাছে পেয়ে একদিকে সরু ফালিতে আঁকেন অতি সূক্ষ্ম ছবি, আবার বিচ্ছিন্ন চাটাই-জমিতে আঁকেন মোটা পোঁচের ছবি। এঁকে নিজেই বিস্মিত হয়ে যান এর সম্ভাবনায়। কেটে-ফেলা বোর্ডের টুকরো বুনন-জমিতে আঁকা শুরু হয়ে যায়, রঙ পড়ে মোটা ঔজ্জ্বল্যে কিন্তু এক স্নায়বিক শক্তির সংহতিতে।

অশোকবাবু লিখেছেন যামিনী রায়ের গত কয় বছরের ছবির ভাস্বরতার প্রসঙ্গে যে, যামিনী রায় 'অধুনা নানাদেশের চিত্রপদ্ধতি ঝালিয়ে' নিচ্ছেন।

কথাটা সম্পূর্ণ নয় এবং অসম্পূর্ণ কথার অর্ধসত্যের বাঁকা আলোয় সত্যটুকুও বোঝা যায় না। অন্য দেশের বা অন্যের ছবির বিষয়ে যামিনী রায় বরাবরই শ্রদ্ধাবান উৎসুক জিজ্ঞাসু। সে জিজ্ঞাসার ঘাট মেলে তাঁর নিজের কর্মধারা থেকে উত্থিত স্রোতে। পুরোনো ছবি সংস্কার করতে গিয়ে রঙের পোঁচ বা তেলের ছোঁয়াচ দিতে গিয়ে, বুননছবি এঁকে, তাঁর রঙ-ব্যবহার পেয়ে গেল নতুন দ্যোতনা, তা ছাড়া রঙের প্রস্তুতি, মিশ্রণ, আঠার তারতম্য—এ-সব তো আছেই। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল স্বভাবের গভীর তাগিদ—আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবন একটা সাম্প্রতিক ভারতীয় আত্মতৃপ্তিতে যতই মেটে ময়লা হয়ে যাচ্ছে, রঙের ভাস্বরতার প্রতিবাদী প্রয়োজন স্নায়ুর গভীরে ততই কি তীব্র হয়ে ওঠে? যামিনী রায়ের কাজে দেখা যায় শিল্পীর নিজের সিদ্ধিকে বারংবার নবনব পর্যায়ে উত্তরণ; অথচ এ-সব অভিযানেই একটি যোদ্ধার শিল্পস্বভাবের ব্যাকুলতার শক্তি স্পষ্ট। তাই তো তাঁর রেখা আবার ভাঙল এক দুর্মর স্নায়ু-শক্তির টানে টানে রঙের আন্তর ভাস্বরতায়, যেখানে বস্তুরূপ যেন প্রাণ পায় রেখার গতিতে ততটা নয়, যতটা রূপের অন্তর্নিহিত বর্ণাভাসের দ্যুতিতে, রেখার স্পন্দনে। এই থেকেই তিনি এলেন, শাহেবী ভাষায়, মোজেইকের খচিত ভাস্বরতার এক ফ্যুগাল বিস্তারে, যাতে লোকসংগীত কাউণ্টর-পএণ্ট থেকে সোনাটা-সিম্‌ফনির সমস্যা নতুন হয়ে আসে গ্রোস্‌ফ্যুগে, বা বুঝি বার্টকের কোয়ার্টেট-এ।

আমার মনে আছে, ঠিক সেই সময়ে যামিনী রায়ের কাছে এল বাইজাণ্টীয় মোজেইকের বই, এবং তাঁর কী তৃপ্তি এই সমর্থন দেখে। তাঁর জীবনে এ-রকম ব্যাপার বার বার ঘটেছে। আজ মনে হচ্ছে সেই সে-যুগের সান্ধ্য আলোর ভাস্বর সুষমার সন্ধান আজ যেন বৃত্ত পূর্ণ করে আসছে সবকটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিমিত ও প্রাচুর্যের মধ্যে রূপের বলিষ্ঠ রেখার আলোকময় স্পন্দনে। এতে মিশরি চিত্র থেকে বাইজাণ্টীয়, দুচ্চ্যো, সিমোনে মার্তিনি—জ্যোত্তোর অগ্রজ মোজেইক-শিল্পী যিনি স্থাপত্য থেকে ছবিকে মুক্তি দিলেন, সেই কাভালিনির গির্জার রঙিন কাচচিত্র, রুশ আইকনচিত্র—সবাই উদাহরণ জুগিয়েছে, সমর্থন দিয়েছে। অবাক লাগে ভাবতে, এই বিচিত্র সম্পূর্ণতা, এর পরে বিকাশের কী স্তর দেখতে পাব কী জানি, এবার কি শিল্পী জীবনের কুরূপকে দেবেন শিল্পের কুরূপবিজয়ী আরেক রূপ?

যামিনী রায়ের শিল্পপ্রেরণার বিষয়ে একটা দোমনা বা লঘুভাবের জন্তই

লেখকের মনে হয়েছে, তাঁর থীমের বৈচিত্র্য খুব কম। না হলে চোখ মেলে এবং ধৈর্যসহকারে কিছুকাল ধরে যামিনী রায়ের কয়েক হাজার ছবি ও কয়েক হাজার ড্রয়িং – চল্লিশ বছর, প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যেপে প্রতিদিনের কাজ দেখলে কেউ এ-কথা বলতে পারতেন না, এমনকি নিছক বিষয়থীমের দিক থেকেও না। বস্তুত, এক পাবলো পিকাসো ছাড়া থীমের এত বৈচিত্র্য বোধহয় পৃথিবীতে আর-কোনো শিল্পীর কাজে নেই।

অবশ্য অশোকবাবুও প্রায় সেই কথা বলেছেন দু-লাইন পরে ছত্রিশ প্যারাগ্রাফে – 'এই বিরাট শিল্পীর সারাজীবনের কাজ এত বিচিত্র যে···'। আশা করি যামিনী রায়ের বৈষ্ণব মনোভাব ও বীজমন্ত্র বিষয়ে পঁয়ত্রিশ প্যারাগ্রাফের মজা করে বলা কথাটা এই উক্তিতে শাক্ত বা নাস্তিক হাওয়ায় উড়ে গেছে। আসলে তিনি যামিনী রায়ের ছবিকে শুধু অবজ্ঞেয় প্যাটার্ন বা ডিজাইন ভেবে মুশকিলে পড়েছেন। অবশ্যই যামিনী রায়ের ছবিতে ডিজাইন বা পরিকল্পনা মূল লক্ষ্য, অনেক প্রাচীন চিত্রকলা বহু দেশের লোক-শিল্প ও অনেক আধুনিক চিত্রশিল্পীর কাজের মতোই। কিন্তু এ ডিজাইন মাতিসের মতো যামিনী রায়ের ছবিতেও চিত্রগত পরিকল্পনা, চিত্রগত বিন্যাস দেয়ালে সাজিয়ে আনন্দ দেবার জন্য। যার ফলে এই ডিজাইনের মাছিমারা সংক্ষিপ্তসার শাড়িতে বা পুতুলে, ধাতুর থালা বা ট্রেতে নকল অত বেমানান লাগে। সেইজন্যই তো যামিনী রায় যখন মাটির জালা বা থালা বা বাটিতে নিজেই ডিজাইন আঁকেন, তখন তার প্রকৃতি পাত্রটির প্রকৃতির মতোই করেন, ছবির ডিজাইনে নয়। তাই ডিজাইন উল্লেখ করে অশ্রদ্ধার রহস্যচ্ছলে বৈষ্ণব বীজমন্ত্র দিয়ে যামিনী রায়ের কোনো কোনো ছবির একাধিক সংস্করণ ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অর্থহীন। তাঁর একজাতের অনেক ছবিতে পরিকল্পনা বা আলেখ্যবিন্যাস বহু সাধনায় অর্জিত সরলতাও নিশ্চয়তা পায় এবং তখন সেই ছবি একাধিক ব্যক্তির ভালো লাগলে একই ছবির লিপি একাধিক ব্যক্তির আয়ত্তে তিনি এনে দেন, দামি সংস্করণের প্রায় সমান দামে – এই তো হত সোজা ব্যাখ্যা।

একটি বেগনি-নীল ঘোমটা-পরা গোরোচনা মুখ দেখে ভ্‌সেভোলড পুদভকিন যখন তন্ময়, তখন ভয়ংকর ইভানের, মায়াকফস্কির অভিনেতা চেরকাসভ সেই ছবিটির জন্যই সরবে কাতর; প্রবল রুশ ইংরেজি সংলাপের মধ্যে তাঁকে বহু ছবি দেখানো হল, কিন্তু অভিনেতা ডেপুটির মন আর ভরল

না ; বিরাট মানুষটি স্পষ্টই ছোট হয়ে যেতে লাগলেন, এমনকি তাঁর মাথা মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে ছোট হয়ে গেল ; এদিকে পুদভকিন তখন আনন্দে বিহ্বল : বাঙালি বধূটি মস্কোতে যাবে, তিনিই কি ওটি প্রথমে বাছেন নি ? শেষটায় ঐ ছবিরই আরেক অনুলিপি চেরকাসভকে শান্ত করল, উল্লসিত নাট্যশিল্পী চৌকি ছেড়ে উঠে লম্বা অতিকায় হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ স্বাভাবিক বড় হয়ে উঠল : ঐ ছবি লেনিনগ্রাদেও যাবে, রাশিয়ায় ঐ দুই মহানগরী, প্রায় রাজধানী—দুই বোন যেন ; একটি যাবে দিরেকতরের সঙ্গে, আরেক আকতরের সঙ্গে।

দ্বিতীয়ত, যামিনী রায় তাঁর সুলভ্য বা দুর্লভ সব ছবিই সাধারণ মানুষকে নন্দিত করতে হাতে দিতে চান ; জীবিকার প্রথামতো বাধ্য হয়ে তাঁকে একটা দাম নিতে হয়, যার জন্য তাঁর অস্বস্তিবোধ সবাই লক্ষ্য করেছেন। যত বেশি মানুষ ঘরে ছবি রাখবে, ততই জীবন ও শিল্পে রুচিবিস্তার ও আনন্দের প্রসার। তাই তো পিকাসো বলেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা হয় অনেক শস্তার এনগ্রেভিং করে অনেক কাপি করে তাঁর ছবি জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দিতে।

কিন্তু যামিনী রায়ের বিরাট চিত্রসম্ভারের মধ্যে টাইপমুখের প্রাচুর্য অশোকবাবু কেন দেখতে পান নি জানি না, বিশেষ করে তাঁর মতো সতর্ক-মন্য সমালোচক যিনি যামিনী রায়ের কয়েক হাজার বিশিষ্ট ছবির মধ্যে একটি পসারিনী (?) এবং একটি ছোট নাচের ছবিও উল্লেখ করতে ভোলেন না! একালের পোর্ট্রেটের বিষয়েও তাঁর কথা মানা শক্ত। গান্ধিজির পাঁচ-ছয়টি পোর্ট্রেটে, রবীন্দ্রনাথের চার-পাঁচটিতে এবং সুধীন্দ্রবাবুর পোর্ট্রেটে যামিনী রায় বিষয়ব্যক্তির একটি চারিত্র্য খুবই স্পষ্ট ধরেছেন, অবশ্যই শিল্পীর দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে।

আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে অশোকবাবুর শেষ উক্তিতে : ভারত অশান্তি চায় কাজেই যামিনীবাবুর শিল্পরচনা ভারত বা তাঁর স্বদেশ গ্রহণ করবে না, কারণ তাঁর ছবি শান্তির ছবি! শান্তির সাধনা তো মানুষ অশান্তির জন্যই করে আর মানুষ শান্তি চায়, ভারতও চায়, বর্তমান পৃথিবীই চায়। দ্বিতীয়ত যামিনী রায়ের চিত্রাবলীতে রূপের সন্ধান জীবনের, আমাদের জীবনের প্রতিবাদ অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তির জন্য, কুৎসিত অসম্পূর্ণ অসুস্থ অন্যায় থেকে ন্যায়সংগত সম্পূর্ণ সুস্থ সুন্দর জীবনের নির্মাণের প্রেরণায়। কোনো শিল্পীর প্রতিভার সীমানিরূপণ-প্রচেষ্টায় এ-রকম কথা চমকপ্রদ হলেও অসার।

বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি

ছবির সার্থকতা মূলত তার দ্রষ্টব্যতায়, ছবির পরোক্ষ আলোচনা গৌণ তো বটেই, এমনকি শিল্পীর চিত্রাবলী বেশ কিছু দেখার পরেই তার যৎসামান্য কম-বেশি সার্থকতা। কারণ দৃশ্যবস্তুর তুলনায় কথা একদিকে জটিল আবার অন্যদিকে অনেক বেশি অনির্দিষ্ট, পিচ্ছিল। আমাদের চোখের অভিজ্ঞতা সচরাচর প্রত্যক্ষে স্পষ্ট হয়, কারো কারো অবশ্য তা-ও হয় না। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের চিত্রকর্ম এতই চাক্ষুষ শুদ্ধিতে ও প্রত্যক্ষতায় স্পষ্ট এবং অধিকন্তু অক্লান্ত প্রেরণার পর্বে পর্বে এতই বহুধাবিচিত্র যে কলমের কথায়, বিশেষ করে কয়েক পৃষ্ঠায়, তার পরিচয় দেওয়া যায় না। তবু যখন শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী এ বিষয়ে লিখতে বলেন তখন সে অনুরোধ আমার শিরোধার্য। এবং বিষয়-মর্যাদার অনুরূপ লেখার যোগ্যতা না থাকলেও যামিনী রায়ের শিল্পসাধনার ঐশ্বর্য বিষয়ে লেখার সুযোগ সর্বদাই আনন্দকর।

যামিনী রায়ের চিত্রের চিত্রধর্মনির্দিষ্ট শুদ্ধতাই বোধহয় তাঁর চিত্রসাধনার সবচেয়ে বড় কথা। আর তাঁর কাজের অবিশ্রাম বৈচিত্র্য বিস্তার। তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফূর্তি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে দৈনিক একনিষ্ঠ কর্মব্রতে প্রকাশ পেয়েছে, ক্রমান্বয়ে এবং কখনো কম কখনো বেশি আততির যন্ত্রণাময় স্বপ্রতিষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টিতে।

যামিনীবাবুর জন্ম ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে, বোধহয় ১১ই এপ্রিল, বাংলার পশ্চিম ভাগে আমাদের লৌকিক ও সামন্ত সংস্কৃতির দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে। বেলেতোড়ের রায়েদের পূর্ব-পুরুষেরা যশোরের প্রতাপাদিত্যের আত্মীয়-পরিবার থেকে মল্লভূমিতে চলে আসেন এবং প্রথমে বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে আশ্রয়ানুকূল্য পান, তারপরে রাজকীয় ব্যাপারের অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে বেলেতোড়ে জাগির বাছাই করেন।

যামিনীবাবুর পিতা নিশ্চয়ই তাঁর মানসলোকে একটি বড় প্রভাব। সে-কালের শিক্ষিত বাবুসমাজের মধ্যে থেকেও তাঁর জীবনদর্শন অসামান্য ছিল।

আমাদের ইংরেজি-যুগের আধাসভ্য বা বিকৃত শহরের জীবনযাত্রা এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রণালী বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তার কথা শুনলে আশ্চর্য লাগে। অবশ্য একালের বিজ্ঞানেই বা সমাজপরিকল্পনার কর্মকাণ্ডেই এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সরল, কিন্তু সংহত, জীবনের তত্ত্ব বোঝা সহজ হয়ে উঠেছে, যেমন হয় তলস্তয়ের ধ্যানধারণা বা গান্ধিজির এবং বৃহৎ আধুনিক মননে রবীন্দ্রনাথের। শিক্ষার কথাই ধরা যাক, যামিনী রায়ের পিতা নিজে ইংরেজি ভালোই জানতেন, বাংলা সংস্কৃতির প্রাগ্রসর মানসলোক তাঁর চেনা ছিল, ব্রহ্মসংগীত তিনি নিজে করতেন। তবু যে-দেশে শতকরা পঁচানব্বইজন গ্রামীণ, সে দুঃস্থ দেশে পরদেশী শাসনের বিকলাঙ্গ শহরে তিনি নড়বড়ে আত্মস্থতার গলিপথ খোঁজেন নি, তিনি মুখে ও কাজেও বলতেন, আমাদের শিক্ষা সার্থকতা পাবে এক হাতে বই আরেক হাতে লাঙলের সমন্বয়ে।

যামিনী রায়ের জীবনদর্শনে তাঁর এই শৈশবের অভিজ্ঞতা ও তাঁর পিতার ভাববীজের অগোচর প্রভাব, তিনি নিজেই বলেন যে, আজ তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন ; কারণ শৈশবে মানুষ খেলে বেড়ায়, মানুষের যৌবন যায় আশা-আকাঙ্ক্ষায় আবেগের অস্থিরতায়, পরিণত বয়সে কর্মক্ষেত্রে ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠায় সে ব্যস্ত থাকে, পল্লবিত বার্ধক্যে অর্জিত মানসিক স্বচ্ছতাতেই মানুষ বুঝতে পারে তার মূলের অভিজ্ঞতার প্রাজ্ঞ তাৎপর্য।

যামিনী রায়ের জীবনদর্শনের আলোচনা এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিষয়টি মনে রাখা দরকার, তাঁর শিল্পসাধনার প্রসঙ্গেই। যামিনী রায়ের মতো শিল্পীর মানস তাঁর চেতন ও অবচেতনের, নন্দনতত্ত্বের ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে সামগ্রিক ব্যাপার। কারণ যামিনী রায়ের মতো শিল্পী মহত্ত্ব অর্জন করেছেন শুধুমাত্র হাজার হাজার উৎকৃষ্ট চিত্ররচনার কৃতিত্বেই নয়, যদিও নিছক শিল্পবিচারে তাঁর মহত্ত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাঁর বিরাট চিত্রসাধনার নিত্যনব এক চিরসত্য রূপদর্শী মুক্তচক্ষুর আনন্দকর বিস্ময় তো বড় কথা বটেই, অধিকন্তু তাঁর প্রতিভার আধিদৈবিক শক্তির ও তাঁর বিকাশের পুরুষার্থ আরেক গভীরতা পেয়েছে তাঁর এই সমগ্র ব্যক্তিগত ঈস্‌থেটিক বা নন্দনতত্ত্বের অক্লান্ত সন্ধানে ও আবিষ্কারে। এইখানেই একজন নিপুণ চিত্রকর এবং একজন স্বকীয় দৃষ্টির ও হাতের কর্তৃত্বে অনন্য মৌলিক আর্টিস্টের মধ্যে তফাত।

যামিনী রায়ের অর্ধশতাব্দীব্যাপী চিত্রকর্মে দেখা যায় এক প্রতিভাযুক্ত

শিল্পীর একক তীব্রতায় একটি ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পরিণতির পর্বে পর্বে দীর্ঘ ইতিহাস, যে শিল্পী তাঁর টেকনিক বা কলাকৌশল এবং তাঁর স্বকীয় রূপদ্রষ্টা ব্যক্তিত্বকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে চান নি। তাঁর ঈস্‌থেটিক অর্থাৎ নন্দন-প্রেরণা সর্বদাই দাবি করেছে সংহতি ও সংলগ্নতায় স্বীয় একাত্মতা। যে-সব দুর্লভ শিল্পীর স্বকীয়তা অনস্বীকার্য, তিনি নিশ্চয়ই সেই স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে একজন। তার কারণ তিনি অনেক চিত্রকরের মতো তথাকথিত স্বকীয়তার পিছনে মরীচিকা-সন্ধান করেন নি, কারণ তিনি সমানে ছবি এঁকে গেছেন, প্রয়োগ পরীক্ষা করে গেছেন প্রকৃত নন্দনশিল্পীর বা জাত-আর্টিস্টের ব্যক্তি-স্বরূপের গভীর উৎস থেকে। এ-রকম জাত-আর্টিস্টদের চৈতন্যে ভর ক'রে থাকে সরল কিন্তু দুর্নিবার, এমনকি নির্মম, এক সৌন্দর্যের দর্শন, তার সমস্ত রকম আকার-প্রকার সমেত, যাতে আর এ-রকম শিল্পীদের মনে কখনো স্থিতির শান্তি থাকে না। এবং এই সংগ্রামসাধনায় যামিনী রায়ের মনে তাঁর চিত্রধর্মের অস্থিষ্ঠ তাঁর জীবনদর্শনের ছন্দে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রবাসীর সাবেক পাঠকদের কাছে বোধহয় নিম্নোক্ত উল্লেখ মনোজ্ঞ হবে।

এ প্রবন্ধের নির্দেশ পাবার পরে সম্প্রতি একদিন রায়মহাশয়ের বাড়িতে ১৩১৬ সালের বাঁধানো জীর্ণাবস্থ একটি 'প্রবাসী'তে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'তপোবন' নামে প্রবন্ধটি। দাগ-দেওয়া অংশের তলায় ও পাশে দেখলুম যামিনীবাবুর মন্তব্য। রবীন্দ্রনাথ সে অংশে বলছেন :

'কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তাল গাছের মতো একটি মাত্র ঋজু রেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বট গাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়।···

'মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা-পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষ-কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানব-সমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

'ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবর্দস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

'এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না ; তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না··

যামিনীবাবুর হাতে লেখা মন্তব্যটিতে তাঁর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর আগে চিত্রসাধনার সেই পর্বে তীব্র সংকটের নিশানা মেলে :

'আমার মনের কথা আজ লিখায় পড়লাম।···ঠিক আট মাস পূর্বে এই কথা উপলব্ধি হয়েছে—১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল—।'

তাই রবীন্দ্রনাথের শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি আবার দাগ দিয়েছেন :

'এইজন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই ক্ষুব্ধ করে—আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে।'

'হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন'—এই বৃহত্তর অনুভূতিই যামিনীবাবুকে তাঁর অসামান্য অঙ্কনরনৈপুণ্যের সাফল্যে সন্তুষ্ট রাখতে পারে নি, পণ্যযুগের ঐশ্বর্যময় ইওরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অঙ্কনরীতি অর্থাৎ রিয়ালিস্‌মের ভেদাত্মক যোগফলমার্কা রীতি তাই আর তাঁকে তৃপ্তি দিচ্ছিল না এবং তিনি জীবিকা বিপন্ন করে প্রচণ্ড আকুতিতে এঁকে যাচ্ছিলেন ছবির পরে পরীক্ষার্থী ছবি, খুঁজছিলেন ভিন্ন ভিন্ন রূপাকৃতির গোটা চেহারা, খুঁজছিলেন সেই সেই রঙের ও রেখার সরল শুদ্ধি ও স্বভাবের গভীরোৎসারিত সত্তা, যাতে তাঁর জীবনের বোধ ও শিল্পীর রূপদর্শন একতায় সহজ হয়ে উঠতে পারে। ঐ-রকম সময়েই যখন তিনি ভারতের রৌদ্রে এবং ভারতের নববাবুসমাজের প্রতিধ্বনিত চাহিদায় রিয়ালিসমের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়ে

মর্মে মর্মে বিচলিত অথচ তাঁর স্বকীয় মার্গ বিষয়ে তাঁর হাত ও মনের অভ্যাস তখনো নিঃসংশয় নয়, এ-রকম সময়েই তাঁর চার-পাঁচ বছরের বালকপুত্রের অপটু কিন্তু প্রকৃত শিশু-চিত্রকরের সত্যদৃষ্টিতে আঁকা ছবিতে স্বকীয় সমাধানের আভাস পান।

যামিনী রায়ের শিল্পীজীবনে দেখা যায়, বারবার এই যন্ত্রণাময় সন্ধান ও বিশিষ্ট রূপ অর্জনের মুখে বা সঙ্গে সঙ্গেই অথবা হয়তো অব্যবহিত পরেই তিনি সমর্থন পান দেশের বা বিদেশের লোকশিল্পী বা কারিগরের বা শিশুদের কাজে। এবং এটা প্রায়ই ঘটে আকস্মিক যোগাযোগের সুযোগে। আর তখন শিল্পী খুশিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বাইজাণ্টীয় পর্বে এটা স্পষ্ট দেখেছি।

এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব তাঁর পঞ্চাশ বছরের চিত্রসাধনার চাক্ষুষ ইতিহাসের একটা ধারণা করা। এই ধারণাটা করতে পারলে বোঝা যায় যে, সৌন্দর্যের কী নির্দেশে, যার কথা সক্রেটিস্ ডিওটিমা আলোচনা করেছিলেন, বাংলার এই চিত্রকরকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সাংসারিক সাফল্যের নিরাপত্তার কূলত্যাগ করিয়ে নামিয়েছিল আপন শিল্পীসত্তার সম্পূরণের দুর্গম সাধনায়। সন্ধানের সেই যুগটি কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্টে বস্তুত এক বীরত্বের ইতিহাস। বাধা যে কী কঠিন ছিল আজকের নবীন পাঠকের পক্ষে তা কল্পনাতেই জানা সম্ভব। কারণ যামিনী রায় আজ দেশে ও বিদেশে সারা বিশ্বে আদৃত শিল্পী। কিন্তু তখন তাঁকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছেন, তাঁরাও দ্বিধান্বিত হয়েছেন, তাঁর শিল্পসাধনার নতুন মার্গকে গ্রহণ করতে। যেমন ধরা যাক শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে ছাত্রাবস্থা থেকেই স্নেহের চক্ষে দেখতেন, কিন্তু সে তাঁর ইওরোপীয় মার্গে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য, তাই অবনীন্দ্রনাথের কথায় ছাত্রাবস্থাতেই যামিনী রায় জোড়াসাঁকোয় গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকেন। যামিনী রায়ের প্রথম পরীক্ষার যুগের ছবি অর্থাৎ যখন তিনি ছবিতে তেলরঙের কাজেও রেখার স্পষ্টতা ও রঙের স্বর-সমতায় মন দিয়েছেন, সে যুগের ছবি দেখে গগনেন্দ্রনাথও খুশি হয়েছেন ও কিনেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়—এঁরাও নবীন শিল্পীকে দিয়ে পোর্ট্রেট করিয়েছেন। এবং অধ্যাপক ভাণ্ডারকর তো বহুকাল ধরে যামিনী রায়ের ছবির গুণগ্রহণ করে যান। প্রবাসীর শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে যামিনী

রায়কে চিনতেন ও স্নেহ করতেন। কিন্তু দেশের তদানীন্তন শিল্পতত্ত্বের আবহাওয়ায় তিনিও কখনো প্রবাসীতে বা প্রবাসী-প্রকাশিত অ্যালবাম-মালায় যামিনী রায়ের ছবি ছাপতে পারেন নি।

এই-রকম কঠিন বাধার মধ্যে যামিনী রায়ের একাকী অভিযান চলল রঙের ও রেখার বা রূপের শুদ্ধির পথে। রিক্ত নিছক রূপের ধূসর ছবির পর্বে পৌঁছে যামিনী রায় বোধহয় প্রথম তৃপ্তিলাভ করলেন। কিন্তু জীবন্ত-স্বভাব শিল্পস্রষ্টা তো কখনো নিজের সিদ্ধিতে স্থাবর হতে পারেন না, তাই যামিনী রায়ও রূপের এই ব্রহ্মচর্যের সিদ্ধ পর্বে আবদ্ধ হতে পারেন নি। তাঁর অশান্ত অন্বেষা চলল আরেক রকম রঙের ইন্দ্রিয়ময়তার সামাজিকতার গার্হস্থ্যে; এল রামায়ণের মানসিকতার, কৃষ্ণলীলার আনন্দবেদনার মাতৃরূপের রেখায় আধৃত সমম্বর বর্ণাঢ্যতা। যামিনী রায়ের মতো ক্রমান্বয়ে আতত শুদ্ধ অর্থাৎ আধুনিক শিল্পীর উত্তরণ বা ক্রান্তি গন্তব্যের স্থিতিতে নয়, গমনাগমনের আন্দোলনেই তাঁর শিল্পীস্বভাবের স্বরূপ প্রকাশিত। শান্তির প্রসাদ তাঁর ছবির লক্ষ্য, কিন্তু তার নিজের শান্তি কোথায়? তিনি বলেন, সুখাদ্য সুপাচ্য জিনিস তৈরি করে যে, সে তো আগুনের কারবারি, আর যে-খাবার খেয়ে আমরা তৃপ্তি পাই, ক্ষুধা শান্তি পায়, সে-খাবার তো আগুনে পোড়া, বা ভাজা বা সিদ্ধ হয়ে তবে তৃপ্তিকর, শান্তিদায়ক। এই শিল্পীর জঙ্গমতার জন্যই বোধহয় যামিনী রায়কে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তাঁর কোন্ ছবি বা কোন্ পর্ব তাঁর নিজের প্রিয়—তখন তিনি বিড়ম্বিত বোধ করেন, তাঁর মনে হয়, গাছ কি তার বিশেষ কোনো ফলকে পক্ষপাত দেয়? গাছ তো শুধু মাটি কাদা জল রৌদ্র হাওয়ায় কাজ ক'রে-ক'রে ফল ফলায়; আর ফল বাছে পাড়ে তো অন্যেরা, যার যা রুচির প্রয়োজন সেই অনুসারে।

তাই এই খ্যাতির শীর্ষে তিয়াত্তর বছর বয়সেও যামিনী রায় তৃপ্তিহীন। তার মানে এ নয় যে, তিনি তাঁর নিজের কাজ দেখে কখনো খুশি বোধ করেন না বা দর্শকের চোখে-মুখে প্রসন্ন বা উত্তেজিত নন্দিতভাব দেখে খুশি হন না। কিন্তু এর মধ্যে একটা ব্যাপক নিরাসক্তিও স্পষ্ট, শিল্পী হিসাবে তাঁর স্বকীয় উত্তম পুরুষ তাই প্রথম পুরুষে সংস্থিত: তাই তাঁর শিল্পীর প্রেরণা ও প্রয়াসের অশান্ত প্রাবল্য অবশ্য তার চিত্রধর্মে রূপান্তরিত হয় রূপদর্শী মনের ও অঙ্কনের প্রক্রিয়ায়, ছাপ রেখে যায় শুধু একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আততির, যাতে একালের আত্মসচেতন ও আত্মসচেতনতার দ্বান্দ্বিক ঐক্যে বিশ্বাসী

মানুষ বারংবার তৃপ্তিলাভ করে। তাই তাঁর চিত্রকর্মের একাধারে বিশিষ্টভাবে বাংলা ও ভারতীয় ও বিশ্বজনীন অথচ স্বপ্রতিষ্ঠ সুস্থ শান্ত জগতে নানান ভিনদেশী মানুষ—মার্কিন শিল্পানুরাগী বা চীনের শিল্পানুরাগীদের সঙ্গেই একত্রে সহ-অবস্থিত হতে পারেন।

বর্তমান লেখকের পক্ষে এখানে আবার যামিনী রায়ের চিত্রসাধনার ভিন্ন ভিন্ন পর্বের আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অথবা কীভাবে ছবি আঁকা সংক্রান্ত নানাবিধ কাজের অভিজ্ঞতা সবকিছুই যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য করেছে সে-আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে, উপসংহারে প্রবাসী-পাঠকদের জন্য লেখকের উপহার হোক বরঞ্চ একজন বিদেশী সমালোচকের একটি সংক্ষিপ্ত লেখার অনুবাদ। সচিত্র লেখাটি 'মহান শিল্পী যামিনী রায়' নামে কয়েক বছর আগে 'ল্'আর' নামক ফরাসী শিল্প-সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল। তাতে এর্ড়ে মাসন্-আ লেখেন :

'চিত্রশিল্পের কথা বলতে গেলে বাধ্য হয়ে ইওরোপের কথা এবং বিশেষ করে ফ্রান্সের কথাই ভাবতে হয়। কিন্তু যদিও আমরা সর্বদা অন্যান্য মহাদেশের কথা মনে রাখি না, অন্যান্য দেশেও আছে গুরুস্থানীয় শিল্পকর্ম এবং সে-সব দেশেও শিল্পজীবন কর্মময়। আমি এক ভারতীয় চিত্রকরের কথা বলতে চাই, ভারতের অগ্রগণ্য নতুন একজন চিত্রকরের কথা।

'উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলা দেশে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর জন্ম, শৈশব থেকেই যামিনী রায় তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ও বহু সমৃদ্ধ জটিল সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের যোগাযোগ চর্চা করেন। বেলেতোড় বাংলার সেই অংশ যে অঞ্চলের এক দিকে বিহারের পাহাড়ে প্রান্ত ও অপর দিকে গঙ্গাভূমির উর্বর ব-দ্বীপের সবুজ ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে বহু জাতির মিশ্রণ ঘটেছিল অতীতে এবং সেই মিশ্রণের ফলে এক সংস্কৃতি তীব্র ও দুর্মর রূপ নিয়েছিল, যার পুষ্টি আঞ্চলিক, যার বিকাশ হিন্দু আচারের এই অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষত্বে। কয়েক শতাব্দী ধরে এই সংস্কৃতির প্রধান বিশেষত্ব দেখা গেছে আর্যধর্মগত চাপের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহের একটা প্রয়াসে এবং আজ সেখানে হিন্দু-ধর্মের যে প্রাধান্য তা সম্ভব হয়েছে নানা অনির্দিষ্ট বা অধিভূতবাদী ও বৌদ্ধ স্মৃতি স্বীকার করেই।

'যামিনী রায়ের সমগ্র শিল্পকর্ম তাঁর এই উৎসের দ্বারা সঞ্জীবিত। পশ্চিম

থেকে আমদানি শিল্পশিক্ষার বিষয়ে তিনি কোনো আপসই করলেন না, এক শুধু সেই জ্ঞানের সাহায্যে সাবেক কোনো অধ্যাত্মপুরাণ ও আবেগবান প্রতীকময় ভারতীয় শিল্পের প্রত্যয়গুলি সহজে উন্মোচিত করা ছাড়া; এবং এইখানেই যামিনী রায় নবপথ-রচয়িতা : এই কারণেই তাঁর প্রতিভা তাঁকে এক প্রাদেশিক শিল্পগুরু মাত্র না ক'রে বরঞ্চ করে তুলল জাতীয়-শিল্পী।

'নবীন যামিনীর পিতা প্রগতির হাওয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ষোলো বছরের পুত্রকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন চিত্রকলা শিখতে, আত্মীয়-কুটুম্বদের মন্তব্য সত্ত্বেও। প্রবল উৎসাহী, নিজের মধ্যে অধিষ্ঠিত, চিত্রকলার রহস্যোদ্‌ঘাটনে উন্মুখ, ভাবীকালের এই সিদ্ধাচার্যের দ্রুত উন্নতি চলল। একুশ বছর থেকেই তাঁর সুনাম। ইওরোপীয় রীতিতে দক্ষ ভারতীয় চিত্রকর তাঁর অধিকাংশ সমকালীনদের তুলনায় তাঁর উৎকর্ষ স্পষ্ট বোঝা গেল। এটা চলল তেরো বছর।

'তারপরে এল সেই যুগ, যখন যামিনী রায় উপলব্ধি করলেন যে, তিনি সিদ্ধহস্তে আঁকছেন যা তিনি চোখে দেখেছেন, কিন্তু যা তিনি অনুভব করেছেন তা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা হয় নি। সেদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিজিতের বংশধর, এবার তিনি হতে চাইলেন স্বাধীনতার সন্তান। তিনি আঁকতে চাইলেন তাঁর রক্তের ইতিহাস, চাইলেন তাঁর দেশের লোককে রূপ দিতে; সেই লক্ষ্যে পৌছতে কোনো আত্মত্যাগই তাঁর কাছে তিক্ত লাগে নি, কোনো বিপদের ভয়ই তাঁকে নিবৃত্ত করে নি। শিল্পের উপায়-উপকরণ? ইওরোপীয় দীক্ষায় দীক্ষিত পশ্চিমা উপকরণে অভ্যস্ত যামিনী রায় এইসব সুবিধা বিসর্জন দিলেন, তাঁর বর্ণফলক তিনি পরিমিত করলেন সাতটি রঙে এবং এই রঙ তিনি প্রস্তুত করেন স্থানীয় মাটি-রঙ চূর্ণ করে তেঁতুল আঠায় বা ডিমের শাদায় মিশিয়ে। ধূসর তিনি আনেন নদীর পলিমাটি থেকে, সিঁদুর-রঙ পান মেয়েদের পুণ্যাচারের সিঁদুর থেকে, নীল তো চাষের নীল, আর শাদা হচ্ছে সাধারণ খড়ির রঙ এবং কালো তিনি মেশান সুলভ ভুষো থেকে। সর্বোপরি, জমি তৈরির জন্য তিনি গোবরের সদ্ব্যহার করেন, দেশের প্রাচীন পুরুষদের মতোই শুধু কার্যকারণের পূর্ণজ্ঞানে।

'পরীক্ষায় অপরিহার্য দ্বিধায় অন্বিত অভিযানের শেষে তিনি অর্জন করলেন তাঁর সব পরিশ্রমের পুরস্কার: এল এক নতুন চিত্রশিল্প, নিশ্চয়ই নতুন পরন্তু তাঁর স্বদেশের মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অস্থিমজ্জায় প্রাণ-

বস্তু। এক হিসাবে ভারতীয় শিল্পই, সব দিক দিয়ে ভাবলে : কিন্তু গভীর ভাবে মানবিক শিল্পও বটে···

'এমনকি তাঁর ধর্মনির্ভর চিত্রাবলীও, তাঁর বিচিত্র 'কৃষ্ণ-বলরাম' এক জীবন্ত শক্তিতে স্পন্দমান ; তাঁর ছবি দেখে অনুভবে আসে ভারতীয় জনসাধারণের জীবনের গভীর নাড়িস্পন্দন, যে জনসাধারণের প্রতিবেশিত্বে এই শিল্পের জীবন। তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁর দেশের লোকের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম : ধর্মগত দৃশ্যাবলী, বিচিত্র আনুষ্ঠানিক নৃত্য, কর্মরত সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। রং দিয়ে, রূপ দিয়ে, সর্বত্রই তাঁর চিত্রলোকে পুনরাবিষ্কৃত হয় চৈত্যরূপ বিরাট ভারতবর্ষ, অধ্যাত্মজীব্য, দুর্জ্ঞেয়, ইন্দ্রিয়জীব্য, লালিত্যে প্রায় নারীস্বভাব।

'অবশ্য যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম ভারতের রূপেই ক্ষান্ত হয় নি : কখনো কখনো তিনি পশ্চিমের প্রান্তেও প্রেরণা খুঁজেছেন। তাই খ্রীস্টের এমন-সব অপরূপ আলেখ্য তাঁর কাছে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে বাইজাণ্টীয় চিত্রের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। এ সাদৃশ্য আরেকবার প্রমাণ করে এই ভারতীয় শিল্পীর স্বকীয়তা। বস্তুত বাইজাণ্টিয়মের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং সেই কারণে যে-সব প্রভাব সেখানে শিল্পীরা পেয়েছিলেন সেই উৎসেই বাইজাণ্টীয় শিল্পে পূর্ব ও পশ্চিমের মনোরম মিশ্রণ। পূর্বদেশীয় যামিনী রায় যখন পশ্চিমে তাঁর প্রেরণা চান তখন সমতুল্য মিশ্রণ ও তাঁর সমতুল্য ফলাফল আশ্চর্য কি ?

'ভারতের বাইরে যামিনী রায় নিঃসন্দেহে একালের মহত্তম শিল্পাচার্যদের মধ্যে গণ্য। কোনো কোনো দিক থেকে, যথা, তাঁর নিটোল ও নিশ্চিত নকশা-বাহারের রমণীয়তায়, তাঁর চিত্র দেখে মাঝে মাঝে মাতিসের ছবি মনে পড়ে। প্রসঙ্গত এটা লক্ষ্য করবেন :

'মাতিসের কাছে পূর্বদেশ একেবারে অনাত্মীয় নয় ; এবং সম্ভবত দুই সভ্যতার, পূর্ব-পশ্চিমের উদ্বাহের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় দুই শিল্পীর এই সাদৃশ্য, যদিও তাঁদের উৎসক্ষেত্র অত ভিন্ন। সে যাই হোক, যামিনী রায় প্রামাণ্য প্রকাশ দিলেন ভারতবর্ষকে, প্রমাণ করে দিলেন এক শিল্পী ভারতের জীবন, তীব্রতা যার প্রবল এবং যার আত্মপ্রকাশ দিনে দিনে আরো এগিয়ে চলবে।'

যামিনী রায়ের চিত্রসাধনা
যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে-র কথালাপ

বিষ্ণু দে

শ্রীযুক্ত যামিনী রায় ও চিত্রশিল্পীর ধর্ম। কয়েক দিন ধরে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের কথা আপনারা শুনেছেন। আজকে আমাদের পাঁচদিন ব্যাপী ইণ্টারভিউ থেকে চিত্রসাধনার সংকটের মধ্যে দিয়ে যামিনীবাবুর অভিযান এবং সেই পথে চিত্রশিল্পীর স্বরূপ উপলব্ধির কথা আপনাদের শোনানো হচ্ছে।

যামিনী রায়

এই থিয়েটারের সঙ্গে আমি অনেক দিন ধরে মেলামেশা করতাম। তা যাঁরা সব অভিনেতা তাঁরা, এই যাঁরা মেয়েরা, ইয়ে করত, অভিনয় করতেন, তাঁরা এসে এই প্রথমেই স্টেজের মাটির ধুলো নিয়ে এমনি করতেন, মানে তাঁরা পেশাটিকে তাঁরা নিজের ধর্ম মনে করত – আমরা – সেইগুলি বরাবরই এটা আছে – তখনো বুঝতে পারি নি যে পেশাটি, এরকম ধর্ম কেন করে – কিন্তু আমার খুব ভালো লাগত—আজকে বুঝি, যে পেশাটাই একমাত্র ধর্ম—যে পেশা দিয়ে আমি দুটো অন্ন ইয়ে করেছি, খেতে পাই। আবার আজকে এই মেশিনারির যুগে, এই যে যন্ত্রযুগ চলেছে, এই যুগে যে এর থেকে মানুষ কতদূরে চলে গেছে—কেননা সে শীতেতে ঘর গরম করেছে গরমকালে ঠাণ্ডা করেছে, জল-কল, টিপলেই জল পাওয়া যাচ্ছে, এই সব মন থেকে —কিন্তু এই কল-জল এই সব কেউ আমরা তৈরি করি নে। আমরা তৈরি করি নে, তার কারণ হচ্ছে যে আমরা বরাবরই সেই যে গ্রামে থাকতাম, গ্রামে ইয়েতে ঐ এখনও কতকটা এই ঘরেতে ফ্ল্যাটেতে বা এই রকম ইয়েতে থাকি। তা এখন দেব্‌তা পুজোটাও ঠিক হচ্ছে নি, আবার এই ফ্ল্যাটেতে থাকা বা এই রকম বাড়ি-টাড়ি করে ঠিক মতন রাখা এ কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না, সর্বদাই, আমি অন্যের বাড়ি তো দেখি নি, আমি নিজের দিক দিয়ে আমার জীবনে আমার সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক হয়েছে, এই গড়া-টড়া সব নিয়ে আমি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারি নে। কিন্তু দেখি যে হ্যাঁ, এইটিই

দোষের, এইটিই জানি, জেনে তবে আমাকে সুস্থির হতে হয় যে কোন্‌খানে বাঘ আছে জানলে, কোন্‌খানে সাপ আছে জানলে যেমন মানুষ সাবধান হয় তেমনি আমার এটুকুর মধ্যেই যে বিরুদ্ধতা সেই টুকু জানলেই এবং সময়ে সেই মতো কাজ করলেই আমার কাজের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। আপনি কি মনে করেন, আমার যে এইভাবেতে মনটা গড়ে উঠেছে, এটা বিশেষ করে এই কয়েক বচ্ছর আরো বেশি, যখন এটা পরের পর একটা পিরিয়ড বলে মনে হয় যে, আগে যে ভাড়ার বাড়িতে থাকতাম তখন নিজের বাড়ি মনে করার কোনো কারণ তো ছিল না, তারপর যখন নিজের বাড়ি হল, তখন, এটিকে যদি নিজের বাড়ি মনে করি, তা হলে এর দোষগুণ নিয়ে কোনোরকমে কিন্তু একবারও মনে হয় না যে এটা আমার বাড়ি। কেবলই মনে হয়, এর গড়নটি তো ঐ আমার মাথা থেকে আসে নি। ওদের ঐ দেশের ইওরোপের মাথা থেকে এসেছিল, আমরা ওদের মতো কতকটা গড়েছি, কিন্তু ঠিক মতো ওদের মতো রাখতে পারি নে। তার জন্য আমি শুধু এইটুকু নীচের টুকুন ব্যবহার করি, ওপরটা ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু নীচের টুকু ব্যবহার করতে গেলেও এটাও আমাকে আবার নানা রকম ভাবতে হয়েছে কতটুকু ব্যবহার কিরকম করব যার জন্য অন্য মানুষ এসে খানিকটা আনন্দ পান হয়তো যা তারা নিজেরাও প্রকাশ করেন। কিন্তু তা বলেই যে আমি খুশি হয়ে আছি তা না, আমার সর্বদাই একটা ইয়ে, যে, না আরো আরো কোথায়, এই যে হচ্ছে, তার জন্য নানা চেষ্টা চরিত্রি, এই বয়সেও এখনো ছাত্রের মতো, মানে আমি শেখাবো, শেখাবো কী কাকে, নিজেই এখনো শেখার জন্য অস্থির হয়ে রয়েছি। প্রতি মানুষের কাছে যে জানা ও শেখার জন্য আমি খুবই অস্থির। এটা শুধু মুখে বলার ঠিক হবে না, অনেক সময়েতে এরকম মুখে বলে তারপর মনে হয় আমার কথাটা এতখানা বলা একটা নিজের সুখ্যাতির মতো, এও একটা অভদ্রতা, কিন্তু আমার তা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না এবং এইটে মনে করে বলি নে যে আমি একজন খুব ঠিকমতো চলছি আর ঠিক ইয়ে করছি এরকমও মনে হয় না। তা আপনি একটু মনে করুন, আমার সঙ্গে কথা কইবার সময়েতে আমি যখন একটু অস্থির হয়ে কথা বলি আর যেমন অনেক দিন পর, হয়তো পনেরো দিন দশ দিন পরে দেখা হল, এই দশ দিনের মধ্যে যে সব আলোড়ন, সেগুলি মনের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে

এসে অনেক সময়েতে একটু বেশি বলে ফেলি। তারপর মনে কষ্ট হয় যে আমার কথাটাই এতখানা বললাম, তা এটা ঠিক মতো, কিন্তু তারপর হঠাৎ মনে হল, আমি যখন কথাটা বলি আর আমি যে কাজ করি, এই দুটো মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই একদিন বলেছিলাম যে আমি থার্ড পার্শন··· হয়ে গেছি—

বিষ্ণু দে

হ্যাঁ হ্যাঁ

যামিনী রায়

এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমি থার্ড পার্শন হয়ে গেছি। কাউকে উপদেশ, মানে,···হ্যাঁ যেটা বলতে বলতে হল যে ঐ রকম সারা সময়েতে যে সাধারণ লোকে সব বুঝতে পারবে—যারা নাটক লিখতেন, তাঁরা এই দেব্‌তাকেই অবলম্বন করে কবিতা লেখা বা গল্প বলা এই সব চলন ছিল। আমরা এখন এই সাধারণ লোককে বোঝবার জন্য যে, আমি তো চিত্রবিভাগ ছাড়া, অন্য বিভাগ হচ্ছে আমার ইয়ে সীমানার বাইরে—চিত্রবিভাগেরই কথা আমি বলতে পারি, অন্য বিভাগের কথা জানলেও বলা উচিত না, বা বলব নি, এটাই হচ্ছে আমার বরাবরের ইয়ে। তো চিত্রবিভাগেতে ছোট ছেলে, সে যে-কোনো দেশের ছোট ছেলে, তাকে এ জিনিসটে যদি ভালো লাগে, তাহলে আমি জানব যে এটা আমার ইয়েটা ঠিকমতো হচ্ছে। তা ছোট ছেলেই, আমার ছোট ছেলের কাছেই এখনো শেখবার জন্যে বা জানবার জন্যে আমার চেষ্টা, যে আমি যে-অবস্থায় এখন এসেছি সেখানেতে একেবারে, সেখানেতে কোনো জটিল বা কোনো ইয়ে কথা, যা এতো খুব, আমার যে কাজটা যেটা আপনি বললেন যে সকলেই বুঝতে পারে—তো ছবি, এমন ছবি হওয়া দরকার, যেটি সকলেই বুঝতে পারে, কিন্তু এমনই সাধারণ দর্শক এই দেশে, এখন যা তারা আবার ছবির মানে খোজে। আমি তো এটা বুঝতে পারি নে এই আজকের দিনে যে, এই যে এই দেশেতেও যারা মডার্ন কবিতা বা ইয়ে, আমার কাছে এই জন্যে একটু শুধু ভালো লাগে যে কবিতাতে যদি এই সব উপদেশের কথা থাকে, আমার কাছে তা মোটেই ইয়ে লাগে না, বরঞ্চ কিছু কোনো কথা যদি না থাকে, শুধু শব্দ বসিয়ে যায়, কোনো মানে হয় না, আমার কাছে সেটা তো ঢের বড় বলে মনে হয়। তা এইজন্য এসেছে এদেশেতে, এরও

খুব দরকার ছিল। এই সাহিত্য সম্বন্ধে কথা হয়, আমি সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা বলি, কোনো দিন এই বক্তৃতা দেবার জন্য বা ছবি সম্বন্ধে কোনো কথা বক্তৃতা দেবার জন্য কখনো বলি নি, শুধু আমার যে চিন্তা ইয়েতে সেটুকু শুধু দু-একজন যাঁরা বন্ধু, বন্ধু ঠিক না, যাঁরা এ সম্বন্ধে খানিকটা ইয়ে করেন, চিন্তা করেন, তাঁদের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনা আমি করেছি বরাবরই—তাতে আমি কোনোদিন গোপন করি নে, আর গোপন করা তো আমার পক্ষে সম্ভবই না, কেননা একমাত্র ছবিই পৃথিবীতে, যে কোনো সভ্যতা, আমার নিজের আজকের যে ধারণা, পৃথিবীতে যত মানুষ যাই কিছু করুক, সে ভাষাতেই হোক, সে গোপন করতে পারে, কিন্তু এই ছবি আর যাঁরা মূর্তি গড়েন যাদিগে ইয়েতে স্কাল্‌প্‌টর বলেন, তাঁরা তাঁদের কাজ দেখে এতটুকুও গোপন করবার···এর চেয়ে বড় ইতিহাস আর নাই—আমার কাছে সব চেয়ে বড় ইতিহাস মনে হয় যে জাতির সভ্যতার সময়ের যুগের সমস্ত কিছু এই ছবি আঁকার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ হয়ে পড়ে—আর তারপর যে ছবি সে কিছুতেই গোপন করতে পারবে নি—সে খারাপ হোক—আমার কাছে খারাপ ছবি ভালো ছবি এই প্রশ্নই নাই—কেননা তার গড়নটা, ছবির যে গড়নটার মধ্যেই গোটা জাতটার পরিচয়, গোটা সভ্যতার পরিচয়, ইতিহাসের পরিচয়, এ ছাড়া···

বিষ্ণু দে

আপনি তো তাই বলেন, আর আপনার ছবির যে সহজ সরল গুণ, সে তো সবাই মানে। তা আপনার অনেক ছবিই আছে যা শিশুদেরও ভালো লাগে, আবার বৃদ্ধদের ভালো লাগে, আবার যৌবনেও ভালো লাগে। আবার এমন অনেক ছবিও আছে যা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভালো লাগে। তবে একটা ব্যাপার থেকে যায় যে হলডেন যে বলেছিলেন, আপনার ছবি দেখে, যে, আপনার ছবি এমনিতে তো দেখে মনে হয় এত সরল, কিন্তু কেন এরকম মনে হয় যে বছরের পর বছর আপনার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, ক্লান্ত লাগে না, অথচ অন্যান্য অনেক শিল্পী যাঁরা আরো অনেক জটিল ছবি আঁকেন, তাঁর ছবি, অতদিন ধরে দেখা যায় না।

যামিনী রায়

সেই তো মজা যে যখন জটিল পৃথিবীতে—সে মানুষের দোষ নয়—এই আসবেই, এই জটিলতা এসেছে যখন তখন এই সহজ জিনিস যে কতখানি

শক্ত—এটা তো একেবারে সত্যি কথা যে এ কতখানি শক্ত জিনিস, সে জিনিসটাই এই জটিলতার মধ্যে পড়ে মানুষগুলির মধ্যে, তার মানে ভেতরের অজানিত ভাবে তাকে এই দিকে আকৃষ্ট করে। এটা, এটা যে শুধু আমি এই ছবি আঁকি বলেই যে এই আমি এরকম বলি তা না—যে জিনিসটা হচ্ছে যে, এই যাঁরা খুব জটিল অবস্থায় শিশুদের যে খেলা, শিশুদের কাজ, শিশুদের কথা, সব মানুষকেই যেমন মিষ্টি লাগে, আবার মানুষ যখন খুব জটিলতার মধ্যে বৃদ্ধ হয়ে বা প্রৌঢ়ের সময়েতে সে যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন এই শিশুদের জন্যই তার প্রাণ আকুল হয়—ঐ রকম কথা, ঐ রকম ব্যবহার। ছবিতেও সেই রকম, সেই ইয়ের থেকে, সেই গড়ন থেকে সমস্ত কিছুই গড়া যায়। সেই টুকু শুধু আমার জানার এবং করার, ঐ হচ্ছে আমার কাজ। যে এই এর মাধ্যমেই সমস্ত কিছু দেখানো যেতে পারে। তো সেই বিষয়বস্তুটি দিয়ে নয় শুধু, আকার গড়নটা কি হবে, এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। এতটুকু যদি ভুলত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে, যেমন এই কোনো জিনিস রাঁধতে গেলে যেমন এতটুকু মশলা বেশি হলে কি নুন বেশি হলে যেমন একটা বিস্বাদ লাগে তেমনি এরও বিস্বাদ লাগবার এখন নানা ইয়ে আছে—এই গড়নটার মধ্যে এতটুকু যদি বিপরীতধর্মীর গড়ন এসে পড়ে, তখন একটু বিস্বাদ লাগতেই হবে। এই এইটিই একেবারে খুব শক্ত জিনিস। কি রকম এটা মনে হয় না ?

বিষ্ণু দে

হ্যাঁ, শুদ্ধ শিল্পের ব্যাপার তো আছেই যেটা আপনার ছবিতে পাওয়া যায়। আর তা ছাড়াও বোধহয় এটাও বলতে হয় যে, যদি আপনি নিজে এই সহজতা বা সরলতা সম্বন্ধে সচেতন না হতেন এবং একে মূল্য না দিতেন তা হলে সম্ভবত আপনার ছবির মধ্যে এই সহজতা এবং সরলতা নিছক টেকনিক্যাল কারণে আসতে পারত না।

যামিনী রায়

অসম্ভব আসা। দুই-ই—টেকনিক এবং তার সঙ্গে মানুষটি, তার মনটি, সব নিয়ে তবে একটা জিনিস প্রকাশিত হয় যে, এই এই যে, কথাগুলো যে, টেকনিক, শুধুই টেকনিক, একেকজন যারা ট্র্যাডিশন মানে বংশগত হিসেবে কাজ করে, তো কারিগর কি কম হয়, কারিগর কম হয় না, তবে তা দিগে, মানে ভুল রাস্তায় একটি লোক যদি কোনো চেষ্টা করে, কেউ ভুল রাস্তায়

নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা হয়, অনায়াসেই তাকে নিয়ে যায়—যে সজ্ঞানে এ কাজ করে তাকে আর ভুল রাস্তায় নিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। এই মানুষের, কতরকম যে কারিগর, যারা এই পৈতৃক ইয়ে থেকে শেখে সেই অদ্ভুত কারিগর, কিন্তু তাঁরা অজ্ঞানিতভাবে, তারা অভ্যেসেতে এটা করে। তা সেইটে যে শুধু অভ্যেসেতে করে বা আপনি যেটা জন্মাচ্ছে, তা কী, সেটা জানাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আর আজকের দিনে এই কথা, যত কথাই বলি না কেন, একটি মাত্র প্রথম সঙ্কল্প ছিল আমার, যে এই কোন্ রাস্তায় যাব? কিন্তু দেখি যে ইওরোপের মতো আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—চীনের মতো আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তিব্বতের মতো আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—পারসিয়ান বা মোঘল পেইন্টিং বা এই যে সব, এ আমার পক্ষে…,কেননা আমি সেই পরিবেশে নাই। কাজেই আমাকে রাস্তা খুঁজতে নিজের মধ্যেই অন্বেষণ করতে হয়েছে, যে এই রাস্তা খোঁজবার জন্যে—তাতে কি সঙ্কল্প ছিল একটি, না ঐরকম চেহারা হবে নি—ছবি ভালো কি মন্দ তা আজও আমার ইয়ে নয়, আমার সঙ্কল্পের মধ্যে নয়। আমার সঙ্কল্প হচ্ছে চেহারাটি আলাদা হোক। তারপর এর গুণ বিচার—আগে দর্শন, তবে গুণ—আগে দর্শনধারী তবে গুণবিচারী। আগে দর্শন, তাই তাতে এর চেহারাটা আলাদা—এইটিই হোক এইটিই ছিল সঙ্কল্প। তারপর যখন আলাদাটা, মোটামুটি সর্বজনে দেখে বললেন, হ্যাঁ আলাদা হয়েছে—আমি চেষ্টা করেছি—তারপর হল কি, না এই, কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে জানা।

বিষ্ণু দে

যামিনী রায় ও চিত্রে রিয়েলিসমের সমস্যা। ছাত্রজীবনের মধ্যেই যামিনী-বাবুকে চিত্রশিল্পে যথাযথ বা বাস্তবের সমস্যা ভাবিত করে এবং তারপরে যখন যামিনীবাবুকে পোর্ট্রেট এবং শৌখিন ব্যক্তিদের জন্য ফরমায়েশী ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছিল, তখন এই সমস্যা, বছরের পর বছর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। আজকে তিনি সেই বিষয়ে নিজের কথা কিছু বলবেন।

যামিনী রায়

আমি মাঝে মাঝে ঐ মডেল থেকে—এই দু-একটা আড্ডার জায়গা ছিল—সেখানেতে আমরা মাঝে মাঝে ঐরকম মডেল নিয়ে আর ইয়ে করতাম,

কাজ করতাম। তা মডেল নিয়ে কাজ করা—কিন্তু আরেকটা মজা—সে ছবিখানা আমার কাছে আছে—আমি ফটোগ্রাফ থেকে যে ছবিটা আঁকতাম কোনোদিনই ঠিক ফটোগ্রাফ—পোর্ট্রেটটা মিলত—কিন্তু তাতে ছবির আকার দেবার জন্যে বাড়ানো কমানো আমার এই ছবিতে ছিল। হঠাৎ এই রয়েল অ্যাকাডেমিতে, ওদের দেশেতেও এটা চল ছিল নি, কিন্তু রয়েল অ্যাকাডেমিতে, কি নামটি ভুলে যাচ্ছি, তিনি এই ফটোগ্রাফ থেকে ছবি আঁকলেন, ছবি এঁকে, সে দলিল আছে, তিনি ঐ অতুল যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখন ··

বিষ্ণু দে

সিকার্ট

যামিনী রায়

অ্যাঁ?

বিষ্ণু দে

সিকার্ট?

যামিনী রায়

উ, হ্যাঁ সিকার্ট। তখন তিনি ঐ রয়েল অ্যাকাডেমির ইস্কুলেতে মাঝে মাঝে আসতেন। এসে ইয়ে করতেন, ক্লাস দেখতেন। সিকার্ট। তিনি ঐ ফটোগ্রাফ থেকে এঁকে দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু সে তিনিই, ঐ দেশে চাল আছে লাইফ থেকে করার, তাব থেকে, ফটোগ্রাফ যে হওয়া সম্ভব সেটা দেখানো। কিন্তু আমাদের দেশে তেমনি যদি কেউ এমনি ঐ রকম ফটোগ্রাফ থেকে, যেটা গতানুগতিকভাবে চাল আছে তার থেকে কোনো জিনিস···ও জিনিস হওয়া সম্ভব নয়। আমি যেটা করতাম, সেটা হল যে··· সেটা দেখাবারও চোখ নাই। বা সে নিয়ে আলোচনাও তো সে সময়ে হতই নে—আজকের দিনে তবু আলোচনা যা একটু হয়, আগের দিনে তাও ছিল না, এ সব আলোচনা···সে তো আপনার তো খানিকটা জানা আছে।

বিষ্ণু দে

আপনার ক্রাইসিস-এর কথা কি বলছিলেন, অনেকখানিই বলেছেন, তারপরে, আমাকে আগেই যা বলেছেন, যে সে প্রায়,. কালকে আপনি নিজেই

বলেছিলেন, যে হাত-পা অচল হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় অনেক জায়গা থেকে অদ্ভুত সাহায্যও পেয়েছেন, যেমন ছেলেদের কাজ থেকে মনে হয়েছে এইখান থেকে যেটুকু পাওয়া যায়, সন্ধান পাওয়া যায়, সেই রকম যদি কিছু বলেন, আর ঐ ফ্ল্যাট টোন থেকে তো আস্তে আস্তে আপনি ব্রাশ ড্রইংয়ে এলেন, মানে একেবারে সেই ধূসর, মানে বিশুদ্ধ যে রূপ, তারপরে তো আবার রঙের দিকে ঝোঁকটা গেল—

যামিনী রায়

রঙের দিকে ঝোঁক নয়। তারপর হল কি, যে ঐ লাইন ড্রইং-টি হওয়ার পর মন হল পেয়ে গেছি। তারপর মনে হল, না, এ তো ছবির ইয়েতে এটা নিয়ে তো বরাবর একটা, ছবির সব বিভাগ তো এতে দেখানো যায় না। এটি হল মূল—মানে তখন জানি নে যে ঐটি মূল—এটি এসে খুব আনন্দ হল ইয়ে তারপর ঐ মনে হল যে, নাঃ, ক মাস, ছ মাস, কি আট মাসের মধ্যে মনে হল, না—তখন আরো ঐ যে ইওরোপীয় ধরনের ইওরোপীয় বড় বড় আর্টিস্টদের আঁকা শিল্পের এবং এই দেশের যে সব ছবি হচ্ছে এ সব নিয়ে নানা চিন্তা কাজ—তখনও তো পোর্ট্রেট ছাড়তে পারি নি, তখনও পোর্ট্রেট চলেছে—তারপর যে ইওরোপীয় ধরনের ছবিতে যে তিন ডাইমেশন কি টু ডাইমেশন এই সব প্রশ্ন কোনো দিন আসা সম্ভব হয় নি। কিন্তু আমার মনেতে এল, জানি নে কি করে এল, যে ফ্ল্যাট ইয়ে তাতে কি করে ছবি, এই ছবি, আঁকা যায়। তাঁর পূর্ব সূচনায় হল কি ঐ ফ্ল্যাট আর যার জন্যে পেছনের ল্যাণ্ডস্কেপটা আমাকে বাদই দিতে হল। আর তখনো চীনের ছবি কিভাবে আঁকে, কেন আঁকল ঐ রকম, মোটামুটি হয়তো চোখে দেখেছি, কিন্তু ঠিকমতো চোখে দেখবার ইয়ে হয় নি। তারপর হল কি যে, চীনে ছবি, চীন দেশে যা আঁকা তার সঙ্গে ওর অনেকটা সিমিলারিটি আছে, ঐ ব্যাকগ্রাউণ্ডটা বাদ দিয়ে একটুকু কোনো রকম একটা-দুটো ইয়েতে একটা-দুটো, যেমন একটু ডাল বা একটু গাছ কি একটু পাথর একেবারে মিনিমাম ইয়েটা দেওয়া আর কি—তা ঐটে তখন মনে হল যে—তখন তাই বলতাম যে, ইওরোপীয় ধরনের আঁকাটা, এই, আমরা এই জানছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে ওদের ইয়েটা যেখানে শেষ হয়েছে, এই আমাদের দেশে ইয়েটা সেখানে আরম্ভ হয়েছে—এটা কানে ছিল বোধহয়। কিন্তু ছবির বেলায় আমার বেশ মনে হল যে ইওরোপীয় ধরনের আঁকাটা

যেখানে শেষ হয়েছে, চৈনিক শিল্পের সেখানে আরম্ভ। এটা আমার মনে মনে ধারণা—সে বিচার ছবি সম্পর্কে যারা ইয়ে করবে, বিচার—সে আলাদা ব্যাপার—কিন্তু এটি আমার ধারণা। ঐটের পর আমাদের লাইন ড্রইং করবার ইয়ে হল। কেন তা জানি নে, কিন্তু শুধু ঐরকম নয়, বহু ইয়ে ঐরকম করে করে ঐ লাইন ড্রইং-এর এক্সিবিশন হল, ইয়ে, আর্ট স্কুল-এর সবাই যাই হোক মোটামুটি সেই এক্সিবিশনটা খুলেছিলেন, স্টেটসম্যানের ঐ যাকে মারবার জন্য ইয়ে করেছিল—ওআটসন ওআটসন! তার একটি চিঠিও আছে, যখন বাইরে বেরোন নি তখন--আমার বাড়িতে যাওয়ার ওঁর ইচ্ছে ছিল—তো ডঃ ভাণ্ডারকর ওঁকে নিয়ে গিছলেন। আচ্ছা, তারপর, ঐ সব হওয়ার পর লোকেও নিলে—কিন্তু আমার মনে ছ মাস আট মাসের পর মনে হল, না, ও তো নয়। এই তখন তিন-ডাইমেনশনাল ওয়ান-ডাইমেনশনাল ফ্ল্যাট ঐটে নিয়ে মনের মধ্যে খুব ইয়ে চলছে। তখন পটল চার বচ্ছরের এই রকম বয়স হবে। এখন আমি ঐ রাত্রিবেলা ঐরকম স্কেচ করি, ঐ ইয়ে দিয়ে, ভুসো দিয়ে, আর ও সেই সঙ্গে আমার সঙ্গে ছিল। হঠাৎ ওর কতকগুলো ছবির মধ্যে দেখলুম, আমি যা চাই তাই। সেই তখন আরম্ভ করলাম এই ধরনের ছবি আঁকতে। তখন আবার পুনরায় আবার আরেকটা ইয়েতে চলে এলাম। তখনো জানি নে যে আমাদের দেশের এই পট ইয়ে এইসব কি হেন তেন এ সব কিছুই সে ইয়ে থাকে নি। তারপর যখন কিছু ছবি ইয়ে করা হল—এই, আঁকা হল—সেই সময়ে একদিন নবু ঠাকুর এসে ঐ বললে যে ঐ আমাদের সোসাইটিতে—সোসাইটিতে যখন এক্সিবিশন করা হল—তখন ঐ ওপেনিং-এর দিন অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ততঃ কিম্ যামিনী? কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ এসে চোখের জল···কিন্তু সে গুলো তো বলা চলে না—

বিষ্ণু দে

বললে তো কিছু ক্ষতি নেই।

যামিনী রায়

আপনি যদি বলেন তবে আমার কোনো ইয়ে নেই। তখন গগনেন্দ্রনাথের চোখে—এই—

বিষ্ণু দে

প্যারালিসিস—

প্যারালিসিস। জিভে। কথা বলতে পারেন না, কিন্তু তিনি ঐ ছবি, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ইয়ে করলাম যে ওঁর চোখ দিয়ে জল। এই গেল ঐ পিরিয়ড, তা তখন ঐ দু-একজন লোক যাঁরা ছবি কিনছিলেন একখানি দুখানি তিনখানি এই। তারপর এই পিরিয়ড আরম্ভ হল—এইটে —ওর পর—ওর পর—গোপিনী ইয়েটা শেষ হবার পর, তখন—

বিষ্ণু দে

রামায়ণ? ঐ ছবিগুলো?

যামিনী রায়

তখন ঐ বাড়িতেই এই ছবি, ঐ ছবি—তখন একেবারে রঙ নিয়ে এ নিয়ে —রঙের মধ্যে তখন মজুমদার শাহেব ইয়ে পাঠিয়ে দিলেন, এখনও আছে কতক সব এই গুলো, এই নীল বড়ি। নীল বড়ি নয়, ঐ গাছের নীল। সেই নীল আর এই—

বিষ্ণু দে

পাটনা থেকে?

যামিনী রায়

পাটনা থেকে। সেই নীল আর ভুসো আর ইয়েলো ওকার আর ভার-মিলিয়ন। এই কটি রঙ। এই রঙে ছবি আঁকতে হল, হয়ে তারপর, কিছুদিন পর আপনাদের সঙ্গে কথা, সুধীনবাবু, আপনি, সারওয়ার্দি শাহেব। এই সারওয়ার্দি শাহেবের বাড়িতে গোপিনী ঐ ওর সেই বইয়ের লাইব্রেরিতে সেই গোপিনী—

বিষ্ণু দে

হ্যাঁ, মাঝখানে—

যামিনী রায়

হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। ওঁর বাড়িতে সেখানে যখন স্যার আকবর হায়দার এলেন, ওঁর বাড়িতে ছবি দেখে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলেন—নিয়ে গোপিনী শোবার ঘরেতে, জানলুম, সরোজিনী নাইডু নিজে বললেন যে, দেখ, ওঁর শোবার ঘরেতে তোমার এইসব গোপিনীর ছবি ছিল। সেই যখন দাঙ্গা

আরম্ভ হয়েছে, সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, শুধু তোমার ছবি হাত দেয় নি। ঐইটেই ওঁর কাছে শোনা। তারপর তো ঐ লড়াই আরম্ভ হল। তারপরই তো লড়াই আরম্ভ হল ?

বিষ্ণু দে

তার বেশ কিছু দিন পর –

যামিনী রায়

কিছুদিন, মানে, হ্যাঁ ৪/৫ বছর পরে। কারণ সরোজিনী নাইডু তখন আমাকে ঐ কথাগুলো বললেন, তখন লড়াই প্রথম আরম্ভ হল –

বিষ্ণু দে

হ্যাঁ, সরোজিনী নাইডু তখন কলকাতায় আসেন। আরম্ভ হওয়ার আগেই আপনার কাছে গিয়েছিলেন। সে ঐ কংগ্রেস স্পেশালে –

যামিনী রায়

না, একবার নয়, কয়েকবারই যান।

বিষ্ণু দে

লড়াইয়ের আগে ?

যামিনী রায়

– হ্যাঁ কয়েকবারই। লড়াইয়ের অনেক আগে কয়েকবারই গিয়েছেন – তখন পদ্মজাও যেত, আর ওঁর, পদ্মজার যে বড় বোন, ঐ যে মারা গেলেন যিনি, উনি, ইন্দিরা, ভুলাভাই দেশাই, ভুলাভাই দেশাইয়ের ছেলে, এরা সবাই তখন যেত। তারপর লড়াই আরম্ভ হল তখন ··

বিষ্ণু দে

শ্রীযুক্ত যামিনী রায় ও তাঁর চিত্রসাধনার ইতিহাস। আজকে সেই যন্ত্রণার ইতিহাসের বিষয়ে তিনি তাঁর পরবর্তী কথাগুলি বলছেন।

যামিনীদা, এই ছবির প্রসঙ্গে, আপনার কয়েকটা বিশেষ ছবির বিষয়ে খানিকটা ধারণা দিন। সেই একটি মেয়ে মাথায় ফুল গুঁজছে, যেটি প্রথম এক্সিবিশনে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে পোর্ট্রেট-এর কাজের কি সম্পর্ক ?

নিশ্চয়, এটা খুব ভালো কথা। ভালো কথা। তা আমি যে কেন ঐ ফ্ল্যাট টেকনিকে ওরকম আঁকতে গেলাম, সে অমনি হঠাৎ একদিন গেলাম তা না। আমি অয়েল কালারে ক্যানভাস নিয়ে দিনের পর দিন রগড়েছি, আর সমস্ত দিন কাজ করে বিকেল বেলাতে সেইটেকে স্ক্র্যাচ্ করে…, কিছুতেই পছন্দ হয় না, কিছুতেই আর পছন্দ হয় না। এই রকম করে দিনের পর দিন যায়, আর এই পোর্ট্রেটটি অর্ডার নিয়েছি, তার এই অ্যাডভান্স নিতে নিতে টাকাটা সব ফুরিয়ে যায়। ছ মাস যায় অথচ সংসার নিয়ে এখানে কলকাতায় থাকা কি করে সম্ভব হয়। নানান রকম করে এই রকম সংসার চালানো, আর সমস্ত দিন কাজ করে এই ইয়ে করলাম, সমস্ত দিন কাজ করে ছবিটি ছুরি দিয়ে স্ক্র্যাচ্ করে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। তখন আমার ঐ থিয়েটারের এই এঁদের সঙ্গে খুব আলাপ-পরিচয় জানাশোনা, মাঝে মাঝে রোজই প্রায় যেতুম। তা সেই যে ঐ অয়েল কালারেতেই ঐ রকম ইয়ে করে রগড়ে রগড়ে যে কোথায় কিছুতেই খুঁজে পাই নে। একদিন, সে ছবিটিও আমার কাছে আছে এখনও, ঐ রগড়ে রগড়ে শুধু, ঐ টিপিক্যাল টাইপ একটু, আর একটা-দুটো রঙেতে কাপড় আর ঐ মুখের গায়ের রং—এই রকম করে একটি ছবি করলাম। এবং সেইটিই করে, ঐ মা-ছেলে এঁকে, সেই ঐ এক্সিবিশনে, তখন ঐ এক্স-স্টুডেণ্টদের এক্সিবিশন হয়। এক্স-স্টুডেণ্টদের এক্সিবিশন? না, তখন ঐ অ্যাকাডেমি তৈরি হয়েছে। অতুল, আমি আর সতীশ আর যোগেশ শীল—তখন ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিরই এক্সিবিশন কলকাতায়—খুব নাম খুব ইয়ে তো আমরা—আমার বাড়িতে বসেই ঐ অ্যাকাডেমির প্রথম পরিকল্পনা। এবং প্রথম সেই ভাঙা টাইপরাইটার নিয়ে—সেইখানে সব লেখাপত্তর করে—সার আর-এন-এর কাছে ইয়ে করে যেয়ে, সেটি অতুলের কাজ, আর আমার কাজ ছিল যে, আমি বাবা ওসব কমিটি-টমিটি কিছু বুঝি নে, আমি তোমার কাজ কর, আর ছবি টাঙাবার ভার বা ইয়ের ভার এসব কাজ আমার। ঐ প্রথম ঐ অতুল আমি সতীশ তিনজনে যামিনীবাবুর কাছে গেলাম। যামিনীবাবু তখন ইস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন। উনি বললেন, ওরে বাবা, আমি ওসব কাজে নেই, তোমরা পাগল হয়েছ। আবার এর কাছে ওর কাছে যাই, কেউ রাজি হয় না। সার আর-এন রাজি হলেন। হয়ে ঐ এক্সিবিশনেতে,

অ্যাকাডেমির এক্সিবিশনেতে, ঐ মা-ছেলের ছবিটি দিলাম। গগনেন্দ্রনাথ দেখতে এসে প্রথমে ঐ ছবিটি কিনলেন। তা ঐ একেবারে ফ্ল্যাট করে। তারপর, তার আগে তো ঐ সাঁওতাল মেয়েটির ছবিটি করেছি—ঐ মাথায় ফুল গুঁজছে—

বিষ্ণু দে

সেটা তো আগেকার এক্সিবিশন—

যামিনী রায়

আগেকার এক্সিবিশন, সেটা হল এক্স-স্টুডেন্টদের এক্সিবিশন।

বিষ্ণু দে

আর অবনীবাবু কোন্ ছবি দেখে বলেছিলেন, যামিনী, ততঃ কিম্?

যামিনী রায়

সেটাও বলি। সেটা তো অনেক পরে। অনেক পরে যে, ঐ ইয়েতে, ঐ মা-ছেলের ছবিটি তো কিনলেন। কিনে তারপরেই বলেছিলেন যে, ইয়ে কর, তুমি আমাদের ছবির এক্সিবিশনে ছবি দিও। তা আমার মনে হয়, এটার সময় নয়, এটার আগেতে, ঐ যখন মাথায় ফুল গোঁজা ছবিতে, ঐ এক্স-স্টুডেন্টদের ছবির এক্সিবিশন যখন হয়েছিল, তখনই ঐ কথা হয়েছিল। না, আমি বোধহয় ভুল করলাম। এটা হল যখন অ্যাকাডেমি তৈরি হয়েছিল। তারপর ঐ ছবি দিলাম—তখন গগনবাবু এসে ঐ ছবি প্রথম কিনলেন। তারপর, ঐ ইয়েতে, ঐ রকম ভাবে ছবি একটি দুটি চারটি বোম্বাই ম্যাড্রাস সিম্‌লে সব জায়গাতে এক্সিবিশনে ছবি পাঠিয়েছি। সব জায়গাতেই বিক্রিও হয়েছে, ইয়েও হয়েছে, বেশ চালু ছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পোর্ট্রেটও চলেছে। কিন্তু আমার মোটামুটি, যেটুকু বছরে একবার এক্সিবিশনে ছবি বিক্রি হয়, তাতে আর কত সংসার চলার পক্ষে সুবিধে হয়। কিন্তু ঐ পোর্ট্রেট আঁকার ঐ সমস্যাটা তখনও রয়ে গেছে, তখনো ছাড়তে পারি নি—ঐ হক্ করছি, রগড়াচ্ছি, আর স্ক্র্যাচ্ করে তুলে দিচ্ছি। তখনও চলেছে পোর্ট্রেট আঁকা। তারপর যে আর পোর্ট্রেট যে আঁকতে···আঁকা ছাড়ব কি ধরব, কি ছবি আঁকব, তাও তখনো জানা হয় নি, তখনো জানা হয় নি। ঐ এক্সিবিশনের সময়েতে যে ঐ দু-একখানা ছবি দোওয়া হত, আর অন্য ছবি যা আসত, অ্যাকাডেমির এক্সিবিশনেতে, তখন এই সব সিম্‌লের থেকে বড় বড়

মিলিটারির শাহেবদের স্ত্রীরা যে ছবি পাঠাত, তারাই ফার্স্ট প্রাইজ পেত— তার তাদের ছবিই যা দু-একখানা বিক্রি হত—আর এ ছবি খুব কমই বিক্রি হত। তা এই এক্সিবিশনের ঐ রকম ভেতর দিয়ে, তারপর এরকম এক্সিবিশনের সময়, মনে হত যে, ইয়ে হোক, ইয়ে তখন সাইমন কমিশন এসেছে। সাইমন কমিশন কি লেখাপড়া, য়ুনিভার্সিটির লেখাপড়া, নিয়ে তো সাইমন কমিশন…?

বিষ্ণু দে

না, ওটা তো রাজনীতি নিয়ে। স্যাডলার কমিশন—

যামিনী রায়

স্যাডলার কমিশন ?

বিষ্ণু দে

নিশ্চয়ই।

যামিনী রায়

হ্যাঁ স্যাডলার কমিশন। তো—

বিষ্ণু দে

১৯১৭ সালে—

যামিনী রায়

হ্যাঁ ১৯১৭ সালে। সে সময়তেই আমি বললাম যে, দেখ, এই যে ছবি, আমাদের ছবি, এক্সিবিশনে ছবি আঁকা হয়, এ ছবিকে যে দেখে কোনো দেশের লোক তো তৃপ্তি পেতে পারে না। এখানেতে এদেশেতে তো এই দেশের মতো কোনো ছবি একটা নাই। তা কি করে এই দেশের ছবি অন্য লোকে দেখে আনন্দ পাবে ? এই রকম সব মাঝে মাঝে কথা হত। তা তখনো আমি নিজে কিছু স্থির করতে পারি নি। প্রতিদিন ঐ সন্ধ্যাবেলায় পোর্ট্রেট এঁকে আর স্ক্যাচ্ করে আর ঐ থিয়েটারে আসবার সময় দু জায়গায় যেতাম—যোগেশ চৌধুরী আমার খুব বন্ধু ছিল, আর শচীন সেনগুপ্ত—উনি ছিলেন আগে বিজলী কাগজ আরো দু-একটা কাগজের এডিটর। উনি থাকতেন গ্রে স্ট্রিটের ওপরে। ওঁর ওখানেতে এসে আরেক কাপ চা খেয়ে, আর এসেই আমার একটু ইয়ে ছিল, এসে ঐ, দু-একখানা এমনি বই পড়ে থাকত। আমি এসে, আমি একটা বই একদিন, এমনি করে খুলে, প্রথম…

সেই বইটি হচ্ছে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, একটি ক্যাটালগের বই। তা সেই বইটি, যে পাতাটি খুলে, সেদিন বোধহয় খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, নিজের মধ্যেই যন্ত্রণায়—তো যে পাতাটি খুলেছি সেই পাতাতেই এমন একটি ঘটনা। দু লাইন পড়েই সবটুকু পড়লাম, পড়ে, আমি তো একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলাম—যে যা খুঁজছিলাম তাই পেলাম। তাতে কি লেখা আছে জানেন? তাতে লেখা আছে যে……এই চৈতন্যদেব তখনো তো খুব নাম করা পণ্ডিতও বটেন এবং ভক্তও তখন হয়েছেন—তখন তাঁর এই অন্য কোনো—তখনকার দিনের সব বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা পড়লে তাঁর মূর্ছা হত, তার জন্যে ঐ—ঐ—

বিষ্ণু দে

স্বরূপ দামোদর?

যামিনী রায়

স্বরূপ দামোদর। উনি ছিলেন সেন্সরের মতন। কারো সাধ্য নেই, ওঁর কাছে গিয়ে কোনো কথা বলা বা কোনো বই শোনানো, এ সাধ্য ছিল নি। সে একটি ইয়ের থেকে, ইস্ট বেঙ্গল থেকে একটি মহাপণ্ডিত একখানি বই রচনা করে নিয়ে এসেছেন। নিয়ে এসে ছ মাস নবদ্বীপে বসে আছেন, চৈতন্যদেবকে আর শোনানো হচ্ছে নি। আর সেই বইখানিই আবার ওঁকেই ইয়ে করা হয়েছে, ডেডিকেট, উৎসর্গ করা হয়েছে। তা উৎসর্গ করা হয়েছে। উনি ছ মাস বসে থেকে—তখনকার দিনে তো ছ মাস এক জায়গায় বসে অন্ন পাওয়া মুস্কিল ছিল—খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তা একজন পার্শ্বচরকে ধরে কোনো-রকম করে স্বরূপ দামোদরকে—ঐটুকু লেখা আছে আর কি—সেটুকু আমি পড়লাম, পড়েই যেটুকু আমার মনে হল, আমি একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলাম। যে স্বরূপ দামোদরকে বলে রাজি করানো হল যে আমরা সব একটা মজলিশ করে বসি, সব পণ্ডিতরে, আমাদের যদি সব শুনে ভালো লাগে, মনে হয়, তাহলে ওঁকে শোনানো হবে। হয়ে পণ্ডিতরা সব বসেছেন সভা করে। তিনি ঐ বইখানি পড়বার আগে যে নান্দীশ্লোক যেটি উৎসর্গ করেছেন সেই শ্লোকটি পড়লেন। পড়তেই সভার সমস্ত লোক একেবারে সাধু সাধু করে উঠল। হয়েই উনি বই আরম্ভ করতে যাবেন, তখন স্বরূপ দামোদর উঠলেন। উঠে বললেন, কাকবিষ্ঠাতুল্য। পণ্ডিতরা সব অবাক হয়ে গেছেন।

উনি ঐ কথা বলেই বসে পড়েছেন। বলেই বসে পড়েছেন! আর ঐ ভাবলেন তখন আমার নিশ্চয়ই কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত, আমি কাকবিষ্ঠাতুল্য বললাম কেন। না, উনি আবার ফের উঠে দাঁড়িয়ে ঐ কথা বললেন যে, এই যে, উনি চৈতন্যদেবকে বইখানি উৎসর্গ করেছেন, তাতে লিখেছেন যে তুমি দারুব্রহ্মতুল্য। যে জীবিত মানুষ, তাঁকে এই যে পয়ারেতেই হোক বা যাতেই হোক লিখতে গিয়ে দারুব্রহ্মতুল্য বলল, এ তো কাকবিষ্ঠাতুল্য। যিনি জীবিত, তাঁকে কি এটা বলা চলে? এই বলে তিনি বসে পড়লেন। তা আমার তখন ইয়ে হল যে, আমরা যে ছবি আঁকছি, এই মানুষের মূর্তি, তাকে এই যে ভাবে যে আমরা আঁকি, আবার এই যে দেবতা আঁকতে যেয়েও, এই যে ইওরোপীয়—তা মনে হওয়ার কারণ আছে—দুটো—যে ইওরোপীয় ধরনের ছবি যে কেন ছাড়ব, এমনি আমি ভারতীয় বা স্বদেশী হবার জন্যে না—ঐ ওদের ছবি, ওদের ছবি আঁকার মধ্যে যতই গুণ থাক, তার মধ্যে একটা জিনিস আমার বরাবরই ইয়ে ছিল যে যখন এই সবচেয়ে নামকরা র‍্যাফেল মাইকেল-এঞ্জেলো—কেননা আমাদের সময়ে এত তো আলোচনা ছিল নি—সবাই যারা একটু শিক্ষিত তারা র‍্যাফেলের নাম করত—তখন র‍্যাফেলের ছবি—এই প্রথম প্রিন্ট ছবি আমরা দেখি—মনে হত যে, এ কি রকম, যে ম্যাডোনা, মেরীর কোলেতে যিশু আছে, আকাশের ওপর দাঁড়িয়ে—এ কি করে, অথচ তার এই ঠিক মানুষের মতো সমস্ত shade and light, অঙ্গ, ইয়ে—এ কি করে আকাশের ওপর দাঁড়ায়? আচ্ছা, এটা সম্ভব নয়, কাজেই এই যে জিনিসটা সম্বন্ধে, যেটা ছাড়তে যাচ্ছি, সেটা যে এমনি রেগে ছাড়ব, তখন এইটিই আমার চিন্তা। ঐ ছবি হচ্ছে নি তা চিন্তা। কোন্ জায়গায় যে কোন্ রাস্তায় যাব সেটা একেবারেই ঠিক করতে পারছি নে।

[অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো-তে যে ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল, তা থেকে পূর্বপরহীন যে তিনটি বৈঠকের টেপ মাত্র উদ্ধার করা গেছে, তার অবিকল অনুলিপি]

শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু লিখতে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন যে তিনি তো লেখক নন, তিনি ছবি আঁকেন; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে স্পষ্টতা পান ছবির রূপে। কিন্তু সে রূপধ্যান তো কথা সাজিয়ে ফোটানো যায় না।

রবীন্দ্রনাথকে যামিনী রায় জোড়াসাঁকোতে বোধহয় দেখেন নি, যদিও ছাত্রাবস্থাতেই অবনীন্দ্রনাথের কথায় তিনি ছ-নম্বরের সেই উপরের ঘরে যেতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকতে। রবীন্দ্রনাথকে দেখার প্রথম স্মৃতি যামিনী রায়ের মনে বহুকাল আগে এলাহাবাদে এক সন্ধ্যায় দেখার। সে ছবি আজও চিত্রশিল্পীর মনে স্পষ্ট। যামিনীবাবু আর্ট স্কুলের শিক্ষার মাঝখানে এলাহাবাদে চলে যান ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করতে। চিন্তামণি ঘোষ তখন খানিকটা অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছাপাবার উৎসাহেই জর্মানি থেকে লিথোগ্রাফার সমার শাহেবকে আনিয়ে তে-রঙা ছবি ছাপার ব্যবস্থা করছেন; যামিনীবাবু সেই জর্মান বিশেষজ্ঞের কাছে রঙছবি ছাপার কাজ করছেন। থাকতেন মেসবাড়িতে; সেখানে সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকতেন। যামিনীবাবুর মন তারিখ-সন দিয়ে চলে না, কিন্তু তাঁর মনে আছে যে তখন তাঁর বিবাহ হয়েছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নি। মনে হয় ব্যাপারটা বোধহয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে। কারণ রবীন্দ্রসদনিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়ের সাহায্যে জেনেছি যে রবীন্দ্রনাথ একবার দিনকয়েকের জন্য এলাহাবাদ গিয়েছিলেন বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে, বোধহয় এক হোটেলে ছিলেন। যামিনীবাবুর ধারণা যে অবনীবাবুদের নেওয়া কোনো বাংলোবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সেদিন আসেন। পরে শুনি পাদরিদের কলেজের এক বাড়িতে বৈঠকটি বসে। চারুবাবুর সঙ্গে যামিনীদা সেখানে যান। উপলক্ষ ছিল জনকয়েক পাদরিশাহেবের সঙ্গে কবির আলোচনা। তাঁরা সব একটা বড় ঘরে বসেছেন। এমন সময়ে যামিনী রায় দেখলেন রবীন্দ্রনাথ আসছেন, ঢিলাঢালা পোশাক, হাতে একটা বিশেষ ধরনের রঙিন লণ্ঠন, লম্বা ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে দরজা পার হয়ে হয়ে তিনি আসছেন, ঐ শরীর ঐ মুখ, চলছেন আর পাটে পাটে

পোশাক নড়ছে আর আলোছায়া নকশা হচ্ছে পর পর। সে এক আশ্চর্য দেখা। যামিনী রায় বলেন যে তখন তিনি জানতেন না, এমনি মনে হয়েছিল, পরে জেনেছেন, যে যিশুরও একটি পরিচিত রূপ হচ্ছে লণ্ঠন-হাতে আলোক-দাতার রূপ। তার আভাস আছে তাঁর আঁকা যিশুর এক ছবিতে।

অনেক বছর পরে আরেকবার ঐ-রকম এক আশ্চর্য দর্শন হয় কলকাতায়, যামিনী রায়ের বাগবাজারের বাসায়। প্রাচীন সরু গলির সেই বাসায় ঢুকেই একটা উঠান ছিল। ভেজানো দরজা খুলে ঢুকেই যামিনী রায় দেখলেন— উঠানে একটা তক্তাপোষ পাতা ছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বসে রয়েছেন। এ ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সে।

তার আগেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার দেখা হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথ কলকাতায় এলে তাঁকে যেতে বলতেন। যামিনী রায় কয়েকবার বরানগরেও কবিসন্দর্শনে গেছেন।

প্রথমবার বরানগর যাওয়া হয় নরেশ মিত্র মহাশয়দের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা তাঁরা নাটকরূপে অভিনয় করবেন; রাস্তায় দেখা, নরেশবাবু বললেন তাঁদের সঙ্গে কবির কাছে যেতে। ওঁদের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যামিনী রায়ের পরিচয় ছিল। কিন্তু ঠাকুরপরিবারের অনেকের সঙ্গে যামিনীবাবুর বিশেষ স্নেহ-ভালোবাসার সম্বন্ধ থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় বিশেষ একটা ঘটে ওঠে নি। যাই হোক, ওঁরা যামিনীদাকে নিয়ে গেলেন, তিনি নীচে বসে আছেন আর নরেশবাবুরা ওপরে গিয়ে নাটক নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ ওপর থেকে ডাক দিলেন, 'যামিনী আর গোপন থেকো না, এসো। যামিনী তুমি প্রকাশ হও।' তারপরে ওপরে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই বললেন, 'দেখ, তোমার ওখানে মাঝে মাঝে যাবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু এরা আমাকে নিয়ে এমন করে যে যেতে পারি নে।'

পরে একবার যামিনীদা সস্ত্রীক যান। যামিনীদার মুখে শুনেছি, 'আপনার বউদিদি তো প্রণাম করে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন, রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওগো তুমি কাছে এসে শোনো, যামিনী জীবনের যে কাজ গ্রহণ করেছে, তাতে তো ওর আর তোমার এক কাপড় আধাআধি করে পরে থাকবার কথা, যাহোক ও এরই মধ্যে সে পর্ব পেরিয়ে উঠেছে"।'

শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের বলা এবং তাঁর অনুমোদনে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক অনুলিখিত একটি রবীন্দ্রচিত্রালোচনা এবং সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি ১৩৫৮ সালের 'সাহিত্যপত্র'তে বেরোয়। তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। –

সেই প্রবন্ধে যামিনীবাবু বলেন :

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এ ক্ষেত্রে পতন প্রায়ই অনিবার্য হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব-আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে।

তাই যামিনী রায় বলেন : রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপবোধের যে আভাস পাই তার জন্য। …রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা তখনই নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দুশো বছর ধরে রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান : ছবির জন্য খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া। তাঁর প্রতিবাদ গোটা শৌখিন ভারতীয় শিল্প, প্রাচ্যশিল্পবাদ সবের বিরুদ্ধে।

যামিনী রায় বলেন : রবীন্দ্রনাথ যদি ছবি না আঁকতেন, তা হলে তাঁর অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ, এই প্রতিবাদ, শুধু একটা ইচ্ছাপ্রকাশ হয়ে থাকত, ছবি এঁকে তিনি একে সত্যরূপ দিলেন।

যদি হই দীন, না হইব হীন—এই কথা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গানে বলেছিলেন, সেই কথাই মূর্ত হল তাঁর ছবিতে। পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে লুকাতে প্রাচীন দৈন্য বৃথা চেষ্টা ভাই—এ প্রতিবাদের সত্য প্রমাণিত করলেন তাঁর চিত্রে। ঐশ্বর্যের সন্ধানে এ দৈন্য তো চাপা পড়ে না, এ দৈন্য যেতে পারে রিক্ততার অবকাশে শুধু নিজের মর্যাদার সতেজ শিরদাঁড়ায়।

যামিনীবাবু তাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে এত শ্রদ্ধাপূর্ণ। যে উপলব্ধি এই চিত্রের রিক্ত তেজে, সেই শক্তিই কি আবার আমরা পাই না রবীন্দ্রনাথের

শেষবয়সের কবিতায়, 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা'য় ? সেকালে যে-রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে', জীবন-উচ্ছ্বাসে।

—সেই ইচ্ছাই প্রকাশের সৌন্দর্য পেল বৃদ্ধের ছবিতে, কবিতায়। তাই রবীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের আলোচনাটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন, এবং কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন।

বিষ্ণু দে : যামিনীদা, আপনার কাছে আগে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথকে আপনার সেই প্রথম দেখা, তার গল্প। সেইটে আজকে বলুন।

যামিনী রায় : সে অবশ্য আজকের অনেক আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ আর ওঁদের সংসারে অনেকে—যেমন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ—সকলেই আমাকে ভালোবাসতেন। সত্যি ভালোবাসতেন। আবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল, সেটা এক-এক সময়ে মনে হয় আর বোকা হয়ে যাই। একবার কবি এসেছেন। আমাকে কয়েকজন এসে বললে, আমরা যাচ্ছি আপনিও চলুন। কিন্তু কোনোদিন যাই নি। একদিন হঠাৎ বাজার করে আসছি। সেই সময় ওঁর একটা বই ইয়ে হয়েছে—নরেশ মিত্র—আর-একটা বই অভিনয় করবার জন্য তারা ওঁর কাছে যাচ্ছে। আমাকে রাস্তায় পেয়ে ওরা মনে করল যে আমার সঙ্গে ওঁদের সংসারের ইয়ে আছে। তার আগে আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল না। আমাকে বলল, আমাকে যেতে হবে। বাড়িতে এসে আমাকে ওরা গাড়ি করে নিয়ে গেল। গিয়ে আমি নীচের ঘরে আছি আর ওরা উপরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অভিনয় সম্বন্ধে কী কী করতে হবে সে-সব কথাবার্তা কইছে। সে সময় অনিল চন্দ মশায় তাঁর সেক্রেটারি ছিলেন। আর একটি ভদ্রলোক—কে—খুব রসিক লোক—আর একটি প্রাইভেট সেক্রেটারি…

বিষ্ণু দে : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ?

যামিনী রায় : হ্যাঁ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—খুব রসিক। আমি নীচে বসে আছি, প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়ির নীচের ঘরে। উনি খবর পেয়েছেন যামিনী রায় নীচে বসে। উনি সেখান থেকেই বলেছেন—'যামিনী, আর গোপন থেকো না, এসো, যামিনী, প্রকাশ হও।' আমি তবুও অনেকক্ষণ বসে রইলুম। তারপর গিয়ে প্রণাম করে বসতেই বললেন, 'দেখ, তোমার ওখানে মাঝে মাঝে যাবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু এরা আমাকে নিয়ে এমন করে যে যেতে পারি নে।' আমি বললাম, 'যাবার দরকার নেই, কেননা আপনার হয়তো ভালো লাগল না, আপনার মুখ একটু এ হল। আর যারা আপনার সঙ্গে থাকবে তারা মুখ বেঁকাবে। তাতে আপনার মুশকিল হবে। তার চেয়ে মাঝে মাঝে আমাকে যদি খবর দেয় আমি গিয়ে বাড়িতে দেখা করতে পারি।' একবার কয়েকজন সাহিত্যিক এসেছিলেন। তার মধ্যে দেবীপ্রসাদ ছিলেন। তাঁরা আমাকে ধরলেন, 'আপনি আগে কিছু বলুন।' আমি বললুম, 'আমার তো লেখা কাজ নয়, আমি কোনোদিন লিখি নি, এ-সব আমি পারি নে।' তাঁরা বললেন, 'আপনাকে যদি প্রশ্ন করি তা হলে উত্তর দেবেন তো ?' আমি বললাম, 'তা দিতে পারি।' তাঁরা পরে একটা দিন স্থির করলেন, ওঁরা এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন। আমি যে কথাগুলো বললাম, ওঁরা সেগুলি ওঁদের বইতে···

বিষ্ণু দে : যামিনীদা, আগে এলাহাবাদে যেদিন আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেন, সেইটে বলুন।

যামিনী রায় : সে বহুকাল আগের কথা, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তখন আমি এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করি। চিন্তামণি ঘোষ মশায় ছিলেন তার কর্তা। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ স্নেহ করতেন, অবনীন্দ্রনাথের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন, তাঁর ছবি ছাপাবার জন্য জার্মানি থেকে একটি শায়েব—লিথোগ্রাফার সমার শায়েব—তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন। বহু টাকা খরচ। রবীন্দ্রনাথের বই আর অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হচ্ছিল। তারপর একবার রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে গেলেন।

বিষ্ণু দে : সেটা বোধহয় 'বলাকা' লেখার সময়।

যামিনী রায় : তা হবে। সময়টা বলা মুশকিল। আমি যখন এলাহাবাদে, তখনো আমার বিয়ে হয় নি। ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করি—সমার শায়েবের সঙ্গে লিথোগ্রাফির কাজ—ওঁর সঙ্গে আমি কাজ করি। রামায়ণের ইলাস্ট্রেশন করি, সমার শায়েবও আমার কাজে খুব খুশি। যাই হোক, একদিন খবর পেলাম রবীন্দ্রনাথ এসেছেন আর ওখানকার মিশনারি শায়েবরা ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন। একটা জায়গা ঠিক হয়েছে, সেই জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ওঁদের সঙ্গে দেখা করবেন, রবীন্দ্রনাথের বাংলোতে ব্যবস্থা হয়েছে—প্রকাণ্ড বড় বাংলো, তখন তো কম বয়েস, কী-ই বা দেখেছি? রবীন্দ্রনাথের নামই শুনেছি, কোনোদিন চোখেও দেখি নি।

সন্ধ্যের সময় গেলাম। গিয়ে বসলাম একটা ঘরেতে। রবীন্দ্রনাথ তখনো এসে পৌঁছন নি। তারপর যে-রকম মজলিশ—তখনকার দিনে যে-রকম জায়গায় সে-রকম মজলিশ হত। কিছুক্ষণ পরেই রবীন্দ্রনাথ সে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ছ-সাত-আটটা দরজা। মাঝের বড় হলটায় যারা অতিথি তারা এসে বসেছে। আর রবীন্দ্রনাথ এলেন সেই ঘরেতে—হাতে একটা রঙিন কাচের লণ্ঠন। আর সেই দাড়ি, সেই পোশাক। যেই তিনি ঢুকলেন সেই ঘরেতে, তারা আর কথা কইবে কি! সবাই হকচকিয়ে গিয়েছে, সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর কী কথাবার্তা হল আমি শুনতে পাই নি বা মনে নেই। আমি শুধু এই ছবিটার পরিচয় দিলাম যে···

বিষ্ণু দে : মানে আলখাল্লার খাঁজে খাঁজে আলো পড়েছে···

যামিনী রায় : হ্যাঁ, আলখাল্লাই বোধহয় হবে আর বড় একটা রঙিন লণ্ঠন। সেই যিশুখ্রীস্ট এ-রকম লণ্ঠন ব্যবহার করতেন। তখন জানতুম না, পরে জেনেছিলুম যিশুখ্রীস্ট ঐ-রকম লণ্ঠন ব্যবহার করতেন। সেই রূপ অদ্ভুত রূপ। তারপরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এবং মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেতাম। একবার সাহিত্যপত্রেও এই প্রবন্ধটা লিখেছিলাম, সেই লেখাটা পড়ে খুব সুখ্যাতি হয়েছিল কিনা আমার মনে নেই। আমি শুধু ছবির আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু আমি একটা চিঠি পেলাম, 'আপনার প্রবন্ধ পড়ে আমাদের মধ্যে কেবলই আলোচনা হচ্ছে···'। রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠি দিলেন আমাকে আশীর্বাদ করে। সেই চিঠিটা

এখনো আমার কাছে আছে। 'আপনার এই লেখা পড়ে আমরা খুব খুশি হয়েছি।' রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—'তোমাকে আশীর্বাদ করি, তোমার জীবন সার্থক হোক।' এই চিঠিটা পেলাম, ওঁদের এই চিঠিটা 'আমরা সাতদিন আপনার এই লেখা নিয়ে আলোচনা করছি।'

রবীন্দ্রনাথের চিঠি
ও
যামিনী রায়ের প্রবন্ধ

যামিনী রায়ের প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের ছবি

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইওরোপীয়ান আঙ্গিকে। তাই তাঁর ছবি বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে আধুনিক ইওরোপীয় ছবির আসল সমস্যা ও উদ্দেশ্য কী।

একজন ইওরোপীয় প্রসিদ্ধ শিল্পী একবার তাঁর সমসাময়িক ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে এই মূর্তিগুলি যদি পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায় তবে হয়তো ভেঙেচুরে কিছু প্রাণ আসে। অর্থাৎ ইওরোপের শিল্পীরা রিয়ালিজম্-এ ক্লান্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নতুন একটা পথ। তাঁরা দেখেছেন শিল্পের অবিমিশ্র সত্যের প্রকাশ হয়েছিল আদিম যুগেই। তখন শিল্পের ওপর সভ্যতার আবরণ দেবার চেষ্টা হয়নি, ঝোঁক পড়েনি ফটোগ্রাফিক ফাই-ডেলিটির দিকে। বিষয়বস্তুর সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্ন-ভাবেই প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। ফলে কোনো গুহায় প্রাগৈতিহাসিক ছবি যখন দেখি—একটা ঘোড়া আঁকা হয়েছে, বুঝি যে ওটা ঘোড়াই, কিন্তু এই ঘোড়া বা ওই ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মতো নিখুঁত বর্ণনা তাতে নেই। অর্থাৎ ঘোড়ার মূল কথাটা আছে শুধু। তারপর সভ্যতা যত এগুতে লাগল তত ঝোঁকটা পড়ল রিয়ালিজম্-এর দিকে। মানুষ নিজের নগ্ন দেহ নিয়ে কুণ্ঠা পেল, খুঁজল আবরণ ও আভরণ, আর তাতে প্রত্যহই বাড়াতে লাগল কৃত্রিমতার বোঝা। শিল্পীও ঠিক একই ভাবে নগ্ন-ভাবাবেগে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন ; নিখুঁত করার চেষ্টা, পালিশ করার চেষ্টা, এদিকেই পড়ল নজর। পালিশ হল, কিন্তু প্রাণটা প্রায় চাপা পড়ল। গঠন বা গড়নটা গেল হারিয়ে। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্প হাঁপিয়ে উঠল। আজকের শিল্পীরা তাই অভিযান শুরু করেছেন এই রিয়ালিজম্-এর বিরুদ্ধে। পালিশ ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও, এই হল তাঁদের কথা।

প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে তাহলে কি আজকের শিল্পের কোনো তফাৎ

নেই? আছে নিশ্চয়ই ; কারণ শিল্পের এই হল ইতিহাস, এর উদ্দেশ্যে ভ্রান্তি থাকলেও এটা সম্পূর্ণ অনর্থক নয়। কারণ, একদিক থেকে এর প্রকাণ্ড একটা শিক্ষামূলক মূল্য আছে। প্রাগৈতিহাসিক ছবি ছিল অবচেতনার স্তরে ; তখনকার শিল্পীরা যে সত্যের আভাস পেয়েছেন তা নিতান্তই আকস্মিক। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে কোনো মূর্তি যদি প্রাণের সন্ধান পায় সেটাও হবে আকস্মিক। এই অবচেতনা ও আকস্মিক সত্যকে চেতনার স্তরে আনা হল আধুনিক শিল্পীর উদ্দেশ্য, এবং এই সচেতন করার ব্যাপারে প্রায় অনিবার্য প্রয়োজন শিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ শিল্প যতদিন রিয়ালিজম্-এর ভ্রান্ত মোহে ঘুরেছে ততদিন ধরে ঘোরার ব্যাপারে অনেক অনিবার্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল: যেমন, ড্রয়িং, রং বা সামঞ্জস্যের দিক। একমাত্র এই অভিজ্ঞতার জোরেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের উদ্দেশ্যকে অব-চেতনের স্তর থেকে চেতনার স্তরে আনতে পারা যায়। তাই দেখতে পাই আজ ইওরোপে যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক ছবির দিকে ঝুঁকেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রথমে কী পরিশ্রম করেছেন রিয়ালিস্টিক ছবির আঙ্গিককে দখল করতে ; অথচ মজার কথা, উদ্দেশ্য এই রিয়ালিস্টিক ছবিকেই ভাঙা : পিকাসো, মাতিস সকলেরই—হবেই বা না কেন? আইন অমান্য যিনি করতে চান তাঁকে তো প্রথম হতে হবে আইনের ব্যাপারেই পাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি-গুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা রংয়ের কথা, সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই : অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলে কল্পনার প্রাবল্য সবসময়ে সমান সজাগ থাকেনা, এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়তো তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন ধরুন তাঁর 'খাপছাড়া'র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা একভাবে আঁকার পর নাক বা চোখের বেলায় টান দিতে গিয়ে তিনি রিয়ালিস্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনো শিল্পীর আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছ ঘেঁষতে পারে নি।

তা ছাড়া রিয়ালিজম্-এর এই যে ছোঁয়াচ তা কি আধুনিক ইওরোপীয়ান শিল্পই সম্পূর্ণ এড়িয়ে আসতে পেরেছে? আমারও মনে হয় আজো তা পারেনি। পিকাসোর কথাই ধরা যাক। কত ভাঙাচোরা করেছেন তিনি, কত প্রাণপণে যুঝেছেন ডাইমেনশনের সঙ্গে। কিন্তু রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ থেকেই যাচ্ছে। দেগাস্ একবার তাঁর চেয়ে আধুনিকদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, 'এঁদের নতুনত্ব কই দেখছিনে কিছু। আমি না-হয় আঁকতে চেয়েছি আস্ত একটা পেয়ালা, আর এঁরা সেই আস্ত পেয়ালাই আঁকছেন ভেঙেচুরে। নতুনত্ব কোথায় তাহলে?' কথাটা অনেকখানিই সত্যি। সত্যি বলতে, সেকেলে রিয়ালিস্টিক চিত্রকলায় ও অতি-আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রকলায় দৃষ্টির কোনো তফাৎ নেই। আমার মনে হয় চীন বলুন, জাপান বলুন, সারা জগতে শিল্পীর দৃষ্টি একই, ব্যতিক্রম শুধু ভারতীয় শিল্পে। রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়া এভাবে আর কেউ কাটাতে পারেনি। পুরাণের একটা ভাবচ্ছবি ধরুন না—জটায়ুর সঙ্গে বাস্তব পাখির কোনো সম্পর্কই নেই, এর জন্ম-ইতিহাসও অদ্ভুত, সেখানেও রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ এসে পড়েনি। কিন্তু জটায়ু বলে একেবারেই চিনতে পারেন না কি? পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ হল চিন্তা-রাজ্যের পাখি, রিয়ালিজমের ছোঁয়াচ একেবারেই নেই। আমার তো মনে হয় যেদিন আধুনিক শিল্পী শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে পৌরাণিক জগতের নিশ্চয়তায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে আঁকতে পারবেন, সেদিনই আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পের আদর্শ পরিপূর্ণ হবে। আমার বিশ্বাস শিল্প এই রকমই কোনো পৌরাণিক জগত সৃষ্টি করার দিকে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপ-বোধের যে আভাস পাই তার জন্য। আজকাল আমাদের দেশে এ ধরনের ছবির বিরুদ্ধে ভীষণ আপত্তি শুনতে পাই, এতে নাকি এ্যানাটমির অভাব। আমার কিন্তু মনে হয় আজকালকার কোনো ছবিতে অ্যানাটমিবোধ যদি সত্যই থাকে তাহলে শুধু এই ধরনের ছবিতেই আছে। কারণ ছবির পক্ষে অ্যানাটমির তাৎপর্য কতটুকু? এ শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশি আর কি? শরীরের পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা। আলোচ্য

শিল্পেই কি সতেজ ভাব সবচেয়ে বর্তমান নয়? রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনই নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দুশ বছর ধরে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান: ছবির জন্য খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়। কি বলতে চাই বোঝাতে হলে দুটো ছবির তুলনা করা ভালো। ধরুন দুজন শিল্পী একটি মেয়ের ছবি আঁকতে চান নিছক কল্পনা থেকে—অর্থাৎ দুজনেই আঁকতে চান না-দেখা মানুষ। একজন এই না-দেখাকে আঁকছেন নিতান্ত ঘরোয়া করে নিয়ে, কল্পনার প্রসার সেখানে নেই। আর একজন মেয়েটিকে আঁকছেন, তাও না দেখেই, কিন্তু তাকে দেখার গণ্ডির ভিতরে টেনে আনার কোনো চেষ্টাই নেই। কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার স্পষ্ট ধরা পড়ে, বৃহৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। পোর্ট্রেট দেখে দেখে আঁকা হয়, তাই বিজ্ঞানী বলে দিতে পারেন মডেল শিল্পীর কত ফুট দূরে কত ইঞ্চি নীচে বসেছিলেন, কোন্ দিক থেকে আলো পড়েছিল, ইত্যাদি। দেখে দেখে যখন মানুষ আঁকি তখন তার মুখ যতক্ষণ আঁকি শুধু মুখই দেখি আর কিছুই দেখি না, আবার দেহের নিম্নাংশ আঁকার সময় মুখ দেখি না, শুধু নিম্নাংশই দেখি। একই মানুষ দশ ফুট দূরে দাঁড়ালে একভাবে দেখি, একশ ফুট দূরে দাঁড়ালে দেখি আর একভাবে, দুশ ফুট দূরে গেলে আবার অন্যভাবে দেখি। কিন্তু সেই মানুষই যখন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখনো কি তাকে দেখি না? তখনো তাকে দেখি, দেখি সম্পূর্ণভাবে, তার সেই চোখে-না-দেখা ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব; রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই ফুটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আজকের মানুষ, তাই বিশেষ কোনো পৌরাণিক জগতের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা তাঁর নেই। তাঁর ছবিতে এই বিশেষত্ব সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার যে আলোচনা হয়েছিল,

এখানে তা অবান্তর হবে না। তিনি বলেছিলেন, আমার তো আর্টস্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয়তো সম্পূর্ণই হয় না। আমি বললুম, এগারো বছর স্কুলে পড়েও তো দেখি ছেলে অনেক সময়ই মুখ্যুই রইল। এদিকে আবার কোনো দিন স্কুলের কাছ ঘেঁষেনি এমন ছেলের মুখেও জ্ঞানের কথা শুনি—ছবির বেলায় আপনারও হয়েছে তাই।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত

যামিনী রায়-কে রবীন্দ্রনাথ
চিঠি

১

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal
২৫ । ৫ । ৪১

কল্যাণীয়েষু,

এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কিছু দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণ ভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাদের দোষ দেই নে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচার-শক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের

সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এইজন্যে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক। ইতি—

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ

যামিনী রায়
কলিকাতা।

২

৭।৬।৪১

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় কল্যাণবরেষু,

ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্য তার একটি অহৈতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি—সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুসী হই তা নয়। দৃষ্টির ওপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম—কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়তো, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখতো। এই হ'ল ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝবো। দেখবার জিনিস সে আমাদের দেয়—না দেখে থাকতে পারিনে; তাতে খুসী হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে—নানা রকম ছাপ পড়্‌ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোন একটা বিশেষত্ব বশতঃ—তা সুন্দর হোক্ বা না হোক্ মানুষ তা'কে আদর করে নেয়, তা'তে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই—দেখতে ভালবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠ্‌ছে। সে কোন তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি—আমি নিশ্চিত আছি এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তা'তে আমি আছি—এই

অনুভূতিকেও কোনোও একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে—সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালমন্দের আর কোনোও রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু—সে অবান্তর—অর্থাৎ যদি সে কোনোও নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগতো কানে, ভাবের রস আসতো মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টান্‌লো, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগলো যা প্রকাশ হ'য়ে উঠ্‌ছে। এছাড়া অন্য কোনোও ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্ত্বা আবিষ্কার করলো। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি—যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন ব'লে আমার বোধ হয় নি। সেইজন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম—তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না; ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে 'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই।

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যামিনী রায়ের প্রবন্ধ

পটুয়া শিল্প

বাংলার চলিত চিত্রকলার সাধারণ বর্ণনা দিয়ে শুরু করা যাক।

চিত্রকলা বাংলাদেশে চলিত ছিল দু-ভাবে; এক হল ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প, আর এক হল পালাপার্বণের শিল্প যাকে পোশাকী শিল্প বলা যায়। বাংলা দেশের আটপৌরে ছবি তার পটের ছবি, আর তার পালাপার্বণের শিল্প দেবমূর্তি, প্রতিমা, ইত্যাদি। এ দুয়ের পার্থক্য স্পষ্ট: প্রথমটিতে প্রসাধনের প্রচেষ্টা নেই, সংস্কারের উৎসাহ নেই। দ্বিতীয় ছবি সংস্কৃত, আভিজাতিক। বেদাদির ঐতিহ্যে তার নির্ভর। গঠনের দিক থেকে এই দু-জাতের ছবির বহু প্রভেদ।

পটুয়া শিল্প বলতে দেশে কয়েকটা কুসংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন যে পটুয়া ছবি আর কালিঘাটের ছবি দুটি শব্দই একার্থবাচক। এমন নয় যে এ-কথার পেছনে কিছুমাত্র সত্য নেই; যদিও সত্য যা আছে তা নেহাতই অল্প। কলকাতা শহর যখন সবে গড়ে উঠছে তখন গ্রামের একদল লোক কালিঘাটে এসে বাসা বাঁধল এবং ছবি এঁকে চলল। এরা ছিল গ্রামের শিল্পী, সেখানে গড়ত প্রতিমা। কিন্তু নগর-সভ্যতার সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসতে বাধ্য হল। কারণ, এরা আঁকতে শুরু করল শহরের চাহিদা মেটাতে—শহর বা শহরের আশেপাশে যে মেলা বসত, সেখানেই তারা ছবি বিক্রি করত। এই ভাবে, নগরজীবনের সংস্পর্শে আসার দরুন, নগরজীবনকে অবলম্বন করে আঁকার দরুন, সে-জীবনের ছাপ এতে এসে পড়ল। এ ছবি তাই আসল পটুয়া ছবি নয়; এর ভাষা রয়ে গেল গ্রাম্য, এর বক্তব্যে এল শহর। প্রসঙ্গ আর আঙ্গিকের মিলন তাই সম্পূর্ণ নয়। আদর্শ বিচ্যুত হল ছবি। বিদেশের সমালোচকরা ছবি সংগ্রহ করেছেন প্রধানত কালিঘাট থেকে। নানান কারণে এর বেশি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই, তাঁরা যে কালিঘাটের ছবির সঙ্গে পটের ছবিকে অভিন্ন

মনে করবেন তাতে বিস্ময়ের অবকাশ অল্প। কিন্তু, দুঃখের কথা, দেশের সমালোচকও প্রায়ই বিদেশীদের ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি তোলেন।

যে ছবি আসল পটুয়া ছবি, ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে, কলকাতা শহর গড়ে উঠবার অনেক আগে, বাংলায় তার প্রচলন ছিল। বরং বিদেশীদের আগমনের অনেক আগেই তার দেহে প্রকৃত প্রাণ ছিল। যে আদিম শিল্পীদল বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই ছবির মূল গড়ন ও বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিল, তাদের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কারণ ছবির জগতে যে কথাটা ধ্রুব সত্য, এরা তার সন্ধান পেয়েছিল। তারপর অবশ্য, দিন যত গেল, পটের ছবি বাংলা দেশে চলিত রইল পটুয়ামহলের নিছক অভ্যাস হিসেবে, এবং শিল্পীরা হয়ে রইল অজ্ঞানেরও অধম। বাংলাদেশে লোকশিল্পের প্রথম যে বোধ এসেছিল সে-বোধ আজকের পটুয়ারা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু, যে শিল্পীসম্প্রদায় এ-বোধ প্রথম পেয়েছিল তারা এত পাকা ভিত্তির উপর একে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল যে বাংলাদেশ আজও অন্তত অভ্যাস হিসেবে, তার জের টেনে চলেছে, তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারে নি। পটুয়া শিল্পের মূল তথ্যকে তাই শুধু বাংলা দেশের ছবির ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় বললে কমিয়ে বলা হবে। শিল্প-ইতিহাসেরই এটা মূল কথা, সমস্ত দেশেই প্রাগৈতিহাসিক ছবির মধ্যে এই ধরনের বক্তব্যের বিকাশ হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশে অন্যপথে হয়েছিল বলেই কিছুদিনের মধ্যে তার ধারা শেষ হয়ে গেল। শিল্পের মূল রহস্য কি তা জানতে হলে যে-কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবি বা বিশেষ করে বাংলা দেশের প্রাকৃত পটুয়া ছবিকে বিশ্লেষণ করতে হবে; কারণ, ছবির মূল সত্যের সন্ধান এখানে এসেছিল।

সব ছবিরই দুটো দিক থাকে, বলবার কথা আর বলবার ভাষা। প্রসঙ্গ আর আঙ্গিক। মূল পটুয়া ছবিকে দু-দিক থেকে দেখলেই বোঝা যাবে কেন একে শিল্পসাধনার অনিবার্য অধ্যায় বলতে হবে এবং কেন বলতে হবে শিল্পের সত্য এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পটুয়া শিল্পের বলার কথাটা কি? নিঃসন্দেহে বিশ্বপ্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি নয়, অথচ প্রকৃতির মূল কথাটুকু দেওয়া নিশ্চয়ই। বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল এ ছবির উদ্দেশ্য। তাই, পটের ছবিতে একটা গাছ দেখলে বুঝি যে ওটা গাছই, তবু এ-গাছ সে-গাছ কোনো-গাছের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। অর্থাৎ গাছের সামান্য সংবাদটুকু আছে মাত্র, বিশেষ

গাছের গ্লানিটা নেই। এদিক থেকে যে-কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে মূল পটুয়া ছবির মিল অনেকখানি। অন্যত্রও শিল্পীর আবেগ নির্ভর খুঁজেছে বস্তুর সামান্য-স্বরূপে। তবু অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে মূল পটুয়া ছবির তফাৎও আছে : প্রথমত, মূল পটুয়া ছবির আবেগ দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর। ('পুরাণ' শব্দে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের সমাজ-উৎস্থত Myth বোঝাতে চাই)। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের দিক থেকে, পটুয়া ছবির পাশেই দেশে ছিল সংস্কৃত শিল্প।

পটুয়া ছবি দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর। এমনটা আর কোনো প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে হয় নি, এবং এমনটা না হলে শিল্পীর একটা প্রধান সমস্যারই সমাধান হয় না। অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক চিত্র কোনো নাচের ছন্দ এঁকেছে, কোনো মানুষ এঁকেছে, কোনো হরিণ এঁকেছে। কিন্তু খাপছাড়া ভাবে। সব মিলে একটা জগৎ নয়, এবং কোনো পুরাণে বিশ্বাস নেই। বাংলার প্রাচীন পটুয়ারা কিন্তু এমন একটা জগতের সন্ধান পেয়েছিল যে জগৎ আগাগোড়া সামান্য-লক্ষণের জগৎ, এবং একটা পুরোপুরি সংহত পুরাণের উপর যার স্থিতি। সেখানে যে জটায়ু সে তো আর মরলোকের কোনো বিশেষ পাখি নয়, অথচ পাখির মূল কথাটা তার মধ্যে রয়েছে। সেখানে যে হনুমান সে তো আর কোনো দৃষ্ট বানর নয়; তার জন্ম-ইতিহাস, তার ক্রিয়া-কলাপ, এর কোনোটাই মরলোকের নয়। তবু বানর বলে তাকে চিনতেও ভুল হয় না। আর সেই জটায়ু, সেই বানর, সেই রাক্ষস সবের মধ্যে আশ্চর্য সংহতি। পুরাণের জগৎ মরলোকের জগৎ নয়; সামান্য-লক্ষণের জগৎ, তবু সংহত জগৎ। আর পটুয়া শিল্পীদের বিশ্বাস এই জগতেই দানা বেঁধেছিল।

শিল্পের পক্ষে এই জাতের একটা পৌরাণিক জগতে বিশ্বাস করবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এখানে শুধু একটা উদাহরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় : ইওরোপের সংস্কৃত-শিল্প বহুদিন খ্রীস্টের পুরাণে বিশ্বাস অটুট রাখতে পেরেছিল, এবং যতদিন পেরেছিল ততদিন অশান্তি জোটে নি। রেম্‌ব্রান্টের পর দেখা গেল সামাজিক অবস্থার প্রভাবে উক্ত পুরাণে বিশ্বাস আর টিঁকিয়ে রাখা কঠিন। শিল্প পুরাণ ছাড়ল কিন্তু এল অশান্তি। গগাঁ ও ভ্যানগগ্‌, গ্রামের সরলতা ও খ্রীস্টের পুরাণ আঁকড়াবার শেষ চেষ্টা আবার করলেন, কিন্তু সম্ভব আর হল না। পশ্চিম ইওরোপের

সাম্প্রতিক শিল্পে প্রকাশ কোনো জীবননির্ভর বাস্তব পৌরাণিক বিশ্বাসের জন্তে মরিয়ার মতো সন্ধান, অথচ, সে আধুনিক মনে কোনো জীবন-পুরাণই আর ধরছে না। তাই অশান্তির শেষ নেই। মূল পটুয়া ছবির পুরাণ-নির্ভরতা তাই লক্ষ্য করবার। যদিও উত্তরকালে এ-বিশ্বাস নেহাৎ অভ্যাসে পরিণত হবার পর শিল্পীর দল যখন গতানুগতিকে পট এঁকে চলল, তখন এ ভিত্তি তারা বিস্মৃত হয়েছে অভ্যাসের অন্ধকারে।

এই তো গেল বলার কথা; এবার বলবার ভাষা নিয়ে আলোচনা করা যাক। তাদের পৌরাণিক জগতের কথা বাংলার পটুয়ারা বলতে শিখেছিল আশ্চর্যরকম ঘরোয়া ভাষায়। তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই, সূক্ষ্ম কারিগরি নেই, বিলাসের চিহ্ন নেই; অথচ, এই আটপৌরে ভাষার পাশেই আমাদের দেশে ছিল সাধুভাষার শিল্প, যাকে বলেছি দেশের পোশাকী শিল্প: দেবতার মূর্তি, মন্দিরের কারুকার্য, সভাগৃহের চিত্র, গ্রামের পালাপার্বণে গড়া প্রতিমা। তার ভাষা গম্ভীর, তার দৃষ্টি শৌখিন, তার ভঙ্গি অতি সংস্কৃত। তবুও পটের ছবি সজ্ঞান ছিল না। কথাটার গুরুত্ব কম নয়। সত্যি কথা, জ্ঞানের কথা অনেক সময় অনেক শিশুও বলে থাকে; তবু যতক্ষণ দেখা যায় এ কথা অজ্ঞানে বলা হয়েছে ততক্ষণ তার মূল্য দিতে আমরা নারাজ। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কথাকে আসল বলতে আমরা রাজি সে-কথা যখন সচেতন। ছবির বেলাতেও তাই। প্রাগৈতিহাসিক ছবি, ছোট ছেলের আঁকা ছবি, অনেক সময় শিল্পের আসল সত্য প্রকাশ করে, বিষয়ের সামান্য-রূপ এঁকে দেয়। তবু তার মূল্য শেষ পর্যন্ত অনেক কমে যায়। কারণ এখানে সত্য কথা সজ্ঞানে বলা হয় না। পটুয়া ছবিতেও তা বলা হয়নি, যদিও পটুয়া ছবির দুটো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, পটুয়ারা সংহত কোনো পৌরাণিক জগতে স্থিতি পেয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় বাকি সব জায়গাতেই প্রাগৈতিহাসিক ছবি লুপ্ত হয়ে গেছে, পটুয়া ছবি সম্পূর্ণ মরে নি। দ্বিতীয়ত, পোশাকী ছবিতে ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পী প্রমাণ রেখে গিয়েছিল যে শৌখিনতায়, সূক্ষ্ম কারুকার্যে, নিখুঁত করার কাজে, পালিশ করার কাজে, তারা কম দক্ষ ছিল না। তবুও উৎসবাদি ছাড়া শিল্পের প্রকৃত দৈনন্দিন জীবনে এর মূল্য নেই। একমাত্র পালাপার্বণেই মানুষ মেকি সাজতে পারে। ফলে পটের ছবিতে গৃহস্থ পাড়ার ভাষায় কথা বলবার ভঙ্গি দক্ষতার অভাবে নয়, সংস্কৃত ছবি আঁকবার কথা জানা ছিল না বলে নয়।

আর কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী এ অবস্থা পায় নি—না ছিল তাদের পৌরাণিক জগতে স্থিতি, না জানত তারা পোশাকী ছবির ভাষা। আর তাই, শিল্পের সত্য অজ্ঞানে আবিষ্কার করেও তাকে ধরে রাখতে ওরা পারল না। সভ্যতার অগ্রসর হলে চাকচিক্যের প্রবল আকর্ষণে সে-শিল্প ভেঙে পড়ল, শৌখিনতার প্রখর আলোয় চোখে লাগল ধাঁধা। শিল্পীর দল কোমর বেঁধে নেমে পড়ল পালিশ করার কাজে, শিল্পের আসল কথা গেল ভুলে। আমাদের দেশে যাকে বলে বিভূতির আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হওয়া অনেকটা সেই রকম। ছবি নিখুঁত হল, ছবিতে পালিশ এল—এত নিখুঁত, এত সংস্কৃত যে কল্পনা করাও কষ্টকর। আঁকা আঙ্গুরকে সত্যি আঙ্গুর বলে ভুল করে পাখি পর্যন্ত ক্যানভাস ঠুক্‌রেছে, এত নিখুঁত। যোগশাস্ত্রে বিভূতি-দর্শনে যেমন নেশা ধরার কথা শোনা যায়, শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি এই সংস্কার করার নেশাও কম নয়। যতদিন এ-নেশা ছিল ততদিন বেশ ছিল। তারপর, শিল্পসাধনায় এই দীর্ঘ ইতিহাসের পর, এতদিনে ইওরোপীয় শিল্পীদের আজ হঠাৎ টনক নড়েছে, নেশা ভেঙেছে। সংস্কৃত করার পথে এর বেশি তো যাওয়া যায় না। এর পর কী? শিল্পী চলবে কোন্ পথে? ওরা দেখলে এখন সব পথই প্রায় রুদ্ধ। অনেকটা দাবা খেলার মতো। যতক্ষণ খেলবার নেশা ছিল ততক্ষণ আলাদা কথা, কিন্তু হঠাৎ এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে পথ আর নেই। যে পথেই যেতে যায় মাৎ হয়ে যায়। এদিকে খ্রীস্টের পুরাণে বিশ্বাসও ক্ষয়ে গেছে এবং আর কোনো পুরাণও খুঁজে পাচ্ছে না। ওরা তাই সমস্ত খেলার ছক লণ্ডভণ্ড করে ভাঙ্গতে চায়, যে চাল এতদিন দিয়ে এসেছে সে সমস্ত চাল ফিরিয়ে নিতে চায়। আজকের ইওরোপীয় শিল্পে এই ভাঙ্গনের রূপ প্রত্যক্ষ। ওরা যদি গোড়া বেঁধে খেলতে শিখত তাহলে এ অবস্থা নিশ্চয়ই হত না।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত

বিষ্ণু দে-কে
যামিনী রায়ের চিঠি

শ্রীশ্রীহরি

১৮।৩।৪২

প্রিয়বরেষু

আজ এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম, আমি এসেই পত্র দিতাম, কিন্তু পাঁচ বৎসর দেশে আসি নাই নানা অসুবিধার মধ্যে পড়ে পত্র দিতে দেরী হচ্ছিল, এখানে না আসার অনেকখানি চেষ্টা করতে হোয়েছে নিজের মনের সঙ্গে আর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে, শেষে হার মেনে, অত্যন্ত অশান্ত মন নিয়ে আসতে হোয়েছিল। যদিও আপনি একদিন বোলেছিলেন বৌমার স্কুল, এখন যাওয়ার অসুবিধা, তবু আমার আন্তরিক কামনা ছিল আপনারা এখানে আসেন, আপনি অসুবিধার কথা লিখিয়াছেন, আপনি ত জানেন আপনাদের জন্য আমার কোন অসুবিধা, অসুবিধাই মনে হয় না। তবে আপনার বা বৌমার যদি একটু বাইরের অসুবিধা হয় সহ্য করতেই হবে, আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি যাতে কষ্ট কম হয়, এখানে এর মধ্যেই খুব রৌদ্র হোয়েছে, আর সঙ্গে একটা রাঁধবার লোক থাকলে ভাল হয় এখানে লোক পাওয়া যাচ্চে না চেষ্টা করছি। আসবার আগে পত্র দিবেন, আমি পটলকে লোক সঙ্গে দিয়ে বাঁকুড়া ষ্টেষনে রাখব, যাতে কোন অসুবিধা না হয়। যে দিন রাত্রের গাড়িতে আসবেন তার ২ দিন আগে পত্র দিবেন কারণ এক একদিন ছোট লাইনের গাড়ী ৪৫ মিঃ পর্যন্ত অপেক্ষা কোরে ছেড়ে দেয় কারণ আজকাল B. N. R.-এর গাড়ীর খুব দেরী হচ্ছে বাঁকুড়া পৌছতে। সেদিন কলিকাতার ডাকও আসে না, কাজেই চিঠি একদিন দেরীতে পাই। হাওড়া ষ্টেষনে একটু আগে আসবেন, রাত্রি ৯।। টায় ট্রেন, এনকোয়ারি আপিসে জিজ্ঞাসা করবেন বাঁকুড়া আসবার ট্রেন কোন প্লাটফরম থেকে ছাড়বে খুব সম্ভব ৭নং। রাত্রি ৩টায় বাঁকুড়ায় পৌছায় সঙ্গে বি, ডি, আর Ry এর ট্রেন প্রস্তুত থাকে, ৪৫ মিঃ লাগে আমাদের বাড়ী আসতে বেলিয়াতোড় ষ্টেষন বি, ডি, আর রেলওয়ে। ষ্টেষন থেকে ৫ মিনিট আন্দাজ লাগে। বি, এন, রেলওয়ে বাঁকুড়া পর্য্যন্ত ইন্টার ক্লাস বোধহয় ৪ টাকা আন্দাজ টিকিটের দাম, আর বাঁকুড়া থেকে বেলিয়াতোড় পর্য্যন্ত ।।/০ আনা। ৫০ টাকায় চলিবে কিনা

লিখিয়াছেন, নিশ্চয়ই চলিবে। প্রথমটা একটু অসুবিধা হইবে নিশ্চয়, একটু সহ্য করিতে হইবে এই দুর্দ্দিনে। তবে আমার যতটা সামর্থ্য ত্রুটি হইবে না। আজ অনেক চিঠি লিখতে হোল,...বৌমাকে বেশী লিখতে পারলাম না, আমি এখনও গুছিয়ে উঠতে পারি নাই..., আপনাদের কথা মনে রেখেই ব্যবস্থা করছিলাম, তবে একটা কথা জানান দরকার: নাগরিক জীবনের একটু আধটুকু ত্রুটি থাকিলেও আন্তরিকতার অভাব হইবে না, আমি শুধু এইজন্য সাহস কর্চ্চি এই দুর্দ্দিনে স্বাস্থ্য নিবাসের সুবিধা ও আনন্দ না পেলেও সুবিধা অসুবিধা মেনে নিতে হবে। আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন বৌমাকে ও ছেলেদের আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। ইতি

আপনার যামিনীদাদা।

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়

১০।৭।৪২

প্রিয়বরেষু

গতকাল আপনার পত্র পেয়েছি। নিজের আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও আমার জন্য এতখানি চিন্তা! আমি ত কামনা করি আপনাদের সকল দিকে মঙ্গল হোক, তার পিছু পিছু আমারও হবে। স্নেহাংশুবাবু ছবির জন্য এই দুঃসময়ে টাকা দিয়েচেন আপনি মধ্যে আছেন আপনাকে কোনরূপ অপ্রস্তুত পড়তে না হয় ছবি ঠিকমত তাঁর কাছে পৌছান ও পরিষ্কার করে দেওয়া আর অন্য ছবিগুলিও, একবার ঠিকমত পরিষ্কার করা এই সবের জন্যই পটলকে কদিনের জন্য পাঠিয়েছি। তার উপর আপনি এই দুর্দিনে যে এতখানি টাকার ব্যবস্থা করলেন, এ আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছার জন্যই। আর এই বার মাস এক রকম ব'সে ব'সে, পুকুরে বঁড়সী ফেলে ফতনার দিকে চেয়ে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়েছিলাম। আমি জানি, আপনারা আমার হাত দিয়ে কিছু কাজ হোক এই কামনা করেন কিছু অর্থও তার সঙ্গে। তাই বোধহয় এতদিন পরে হঠাৎ একটি সূত্রধর মিস্ত্রি পেয়ে কাজ আরম্ভ কোরেছি, বড় কাঠের মূর্ত্তি চারটা শেষ কোরেছি এই কদিনে ছবিও কিছু আঁকা হোয়েছে, মূর্ত্তিগুলো দেখলে আপনার ভাল লাগবে বোধহয়,

আর ভাল লাগলে আমি তৃপ্তি পাব। পটলকেও পত্র দিলাম আপনার কাজ শেষ না হোলে যেন না আসে।

বৌমার স্কুল ও আপনার কলেজের ব্যাপারের জন্য উৎকণ্ঠিত রইলাম, চিঠিটা পেলেও কতকটা উৎকণ্ঠা কমে। এখানে এসে যে মোটা টাকাটা খরচ হোয়েছে তার পরিবর্ত্তে কোন রকম স্বয়াস্থি পান নাই এর জন্যে আমার এখনও ব্যথা আর নাই, এটা একটা দুর্ব্বিপাক বোলেই সবটা মানিয়ে গেল। বৌমা ইরা তারা কেমন জানাবেন, মা ও মাধব এখনও কি পুরুলিয়ায়? কেশবের জন্য উৎকণ্ঠায় আছি, তার একটা কিছু কাজ হওয়া একান্ত দরকারই অথচ এখান থেকে চেষ্টা করলে কোন ফল হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না, তাই মাহিন্দ্রর স্ত্রীর ছবিখানা আরম্ভ করেছি। অন্যান্য বন্ধুদের আমার কথা জানাবেন। দেবী বোধহয় পরীক্ষার জন্য খুবই ব্যস্ত বুদ্ধদেববাবুর খবর জানাবেন, কেমন আছেন। সমর কি চলে গেছে। অরুণবাবুর খবর আশাকরি ভাল। বৌমাকে আজ আর পত্র দিতে পারলাম না, তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। ইরা তারাকে আশীর্ব্বাদ করছি। আপনি নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়

২২।৭।৪২

প্রিয়বরেষু

আপনার পত্র যথা সময়ে পেয়েছি, পটলও এসে পৌছেচে তার হাতে ২৫৲ টাকা পেয়েছি। মাটিসের বইখানি আগামীকাল পাঠাব পটল কোন রকমে বেঁধে ছিল ঠিক হয় নাই বইখানি সেখানে পৌছলে একবার দপ্তরী বাড়ী পাঠাবেন। আপনার বন্ধু মিঃ আরুইন্ কি এখন কলিকাতায় থাকিবেন, তাঁর পুরা পরিচয় অনুগ্রহ কোরে জানাবেন। ছেলেদের আঁকা ছবি ১৬ই শ্রাবণ মধ্যে নিশ্চয়ই পাবেন, ও দেখাবার ব্যবস্থা করবেন, ইতিমধ্যে আরও ছবি কিছু যোগাড় হয়েছে, আমিও এখন পুরাদমে কাজ কর্চ্ছি, এখন একটু মন বসেছে। আর কাঠের মূর্ত্তিও দেখাতে পারব, আপনাদের

ভাল লাগতে পারে মনে হচ্ছে। কিন্তু থেকে থেকে কলিকাতার আপনাদের সঙ্গর জন্য মনটা ব্যাকুল হোয়ে উঠছে, যদিও ২/১জনকে যাবার জন্য জানিয়ে ছিলাম, কিন্তু আপনার এবং সুধীন্দ্রবাবু সুরাবর্দ্দি সাহেবের মত নাই অবশ্য টাকার বাজার ত নিজে অনুভব কর্চ্চেন অত্যন্ত সন্তর্পণে চলি বলেই এখন পর্যন্ত কোন রকমে চলে গেল আগামী অবস্থার জন্য এখনও তেমন প্রস্তুত হই নাই, তাই প্রথমে একটু কষ্ট পেতে হচ্ছে, পটল থাকতে মিসেস্ মিলফোর্ড তাঁর এক বন্ধুকে এনেছিলেন তিনখানা ছবি নিয়ে গিছলেন, আজ খবর পেলাম, তাঁর ছবি নেওয়া হয় নাই, দেখতে নিয়ে গিছলেন। সুখবর। মৃণাল গিছল লিখেছেন কেন গিছল জানাবেন। বৌমার চাল কিরোসিন ও অন্যান্য জিনিষগুলি ঠিকমত রেখেছি এখনও, যা টাকা খরচ হোয়ে গেল এখানে, এনেও স্বস্তি একটুও দিতে পারি নাই, এ ক্ষোভ আমার যাবে না, বৌমা বোধহয় খুবই ব্যস্ত তাঁর শরীর কেমন জানাবেন। ইরা তারার শরীর কেমন আছে? কেশব কেমন আছে? আমি সেখানে না গেলে তার সম্বন্ধে কিছু করা গেল না, ইতিমধ্যে কিছু একটা হোলে সুখী হতাম। মাধব ও মা এখন কি পুরুলিয়ায়। বুদ্ধদেব বাবু নিশ্চয়ই কলকাতায় ফিরেচেন একটা চিঠি লিখা দরকার। আছেন কি না? তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? দেবীর কি পরীক্ষা শীঘ্র আরম্ভ হবে, কেমন আছে? সমর কোথায়? অরুণবাবুর খবর জানাবেন আইয়ুব সাহিব কোথায় কেমন আছেন তাঁদের খবর জানতে ইচ্ছা করে তাই এত লিখে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। আর হীরেন্দ্রবাবুকে আমার কথা জানাবেন, তাঁদের জন্য মাঝে মাঝে মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয় কত দিন আর এমন করে কাটাব? মৃণালিনী ও আইলিন এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কি? সাক্ষাৎ হোলে বলবেন আমার কথা। মিঃ এমার্সনের কোন খবর পাওয়া গেলে জানাবেন। শীলা কি কলিকাতা এসেছে? সুধীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বোধহয়। আগামী ১১ই শ্রাবণ ৺ধর্ম্মরাজের গাজন, বলতে সাহস হয় না, অসুবিধা বোধহয় গোটাটাই, এমন কোরে লিখলাম বোলে মনে করবেন না আমার ইচ্ছা নাই, আন্তরিক ইচ্ছা খুবই শুধু টাকার প্রশ্ন। আপনার অসুবিধা না থাকলে পত্রপাঠ জানাবেন সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে জানাব পূর্ব্বেই। আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়

৯।৯।৪২

প্রিয়বরেষু

অনেক দিন চিঠি পাই নাই, আমি নানা রকম অসুবিধার মধ্যে থাকলেও নিজেরটা তত মনে হয় না, আপনাদের নানা বিরক্তিকর অসুবিধা ভেবে এখনও কষ্ট পাই তবে আর বেশী দিন এখানে থাকলে এটুকুও হয়তঃ থাকবে না। পরিবর্ত্তন দরকার তা বোলে এতখানি খুবই কষ্টের কারণ। একটা লক্ষ্য না থাকলে কি কোরে কাজ করা যায়। (আমি ত পারি না, প্রথমতঃ জীবিকার জন্যই কাজ। সেইটারই অভাব। কাজের জন্য কাজ শিল্পের জন্য শিল্প এতটা উঁচুতে উঠ্‌তে পারি নাই তারপর অমনি অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। ছবি আঁকার জন্য প্রথমতঃ বুদ্ধি বিদ্যা দরকার, এরই সেই ছবি যে ঘরটিতে থাকবে তার সাজন, সকলের উপরে বিরুদ্ধ পথ, এই রকম আরও নানা অশরীরী মায়া মোহ, এই সব পরিবেশ না হোলে কাজের জোর পাই না, যেন লক্ষ্যহীন হোয়ে করা, শুধু কাজের)

লক্ষ্যহীন ভাবে কাজ করার অভ্যাস নাই, এখানে বসে কিছুতেই একটা লক্ষ্য স্থির করতে পার্চ্ছি না, ছবি শুধু আঁকা ছাড়া এর আরও অনেক দিক ভাবতে হয় যেটা না ভাবলে, ছবির একটু ভোলবার জন্য আপনাদের এই চিঠি লিখতে ব'সেছি।

আমার জীবনে, একমাত্র বন্ধুই অন্ন বস্ত্র ঐশ্বর্য যা কিছুই। সম্বল বন্ধু জন। কাজেই মানুষের যেমন বাড়ী, ঘর, ব্যাঙ্ক, এই সব হোলে সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা তার ধর্ম্ম ও অর্থ আমার অন্য সম্পদ নাই, কাজেই বন্ধুদের মঙ্গল কামনায়, ধর্ম্ম অর্থ দুইই। সেখানে ক্ষতি হোলে কষ্ট পাই। কদিন আগে আপনার পাঠান ৩৫৲ টাকা পেয়েছি।

আপনাদের কথা কিছুই লেখা হোল না, আমার কথাই এক গঙ্গা লিখলাম। বৌমা ইরা তারাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। আপনি আমার নমস্কার নেবেন। বৌমাকে আলাদা কোরে পত্র দিলাম না, দুজনের উদ্দেশ্যেই লেখা বোলে। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়
১৮।৯।৪২

প্রিয়বরেষু

পিছনের চিঠি খানা ৯ দিন আগে লিখেছিলাম, মনে করে ছিলাম, একটু পরিকার কোরে লিখে ডাকে দোব, তারপর আর দিতেই পারি নাই, কিছুই ভাল লাগছিল না, কাজে মন বসছিল না, কদিন থেকে। তাই একটু বড় কোরে চিঠি লিখে, ফেলে রেখে দিয়েছিলাম, ডাকে দিতে পারি নাই। অবিশ্যি খুব হাল্কা মন, নাটকীয় ভাবভব্য সমাজে অচল, কাজ করার পক্ষেও বিঘ্নকর, তবু সব মানুষেরই এটা থাকে বোধহয় কোন না কোন যায়গা প্রকাশ পায়ই। তাই এই কাটা কুটি চিঠি খানাই আপনাকে পাঠালাম, এতে বরং রস থাকে একটু। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোন দিকে ত্রুটি নাই, এমন কাজ ব্যবহার লেখা ছবি সবই সামাজিক দিক থেকে দেখতে শুনতে বেশ, তাতে প্রাণ থাকে কম, প্রাণ থাকা কাজ সামাজিক ভাবে অচল হোলেও ব্যক্তি ও স্থান বিশেষে এটা বলে তাই আপনাকে এমন রকম ভাবে চিঠি লিখতে বাধল না। আজ বিকালে কাগজ পেলাম, সকালে ডাক আসে নাই, সে কাগজে পরম শ্রদ্ধাস্পদ যোগেশ দাদার মৃত্যু সংবাদে মন অত্যন্ত কাতর। তাই জোর থাকে না। হয়ত এটা কিছু না, বা ঠিক নয় কিন্তু আমার এ সব না ভাবলে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। হয়তঃ এই কোরে আমি যন্ত্রণা সৃষ্টি করি বেশী কোরে, তার উপর ত সাংসারিক, প্রাকৃতিক, রাষ্ট্রগত, সমাজগত নানা অসুবিধা আছে। ভাবলে এগুলো খুবই দরকারী মনে হয় কারণ সুস্থ মানুষের কাজ চিকন হয়, জাত যখন সুস্থ, তখন কার কাজ দেখলেই বুঝা যায়, আমার বা আমাদের তাতে মন উঠে না, কি করা যায়? কালের চিহ্ন থাকবেই, আমরা যাকে পানসে বলি। এইটাই (কালের) সমাজের, সেই সময় কার চিহ্ন। আজ এখানে রৌদ্র হোয়েছিল, রাত্রে ব'সে চিঠি লিখছি, সকলেই সুস্থ হোয়ে ঘুমুচ্ছে, তাই আমিও সুস্থমনে চিঠি লিখতে বসে অনেকটা লিখে ফেললাম, হয়তঃ আপনি এমন পরিবেশের মধ্যে, যাতে এই রকম চিঠি পীড়া দেবে, আপনাকে এই রকম তত্ত্ব কথা শুনান খুবই বাহুল্য মনে করি। কারণ আমি জানি আপনি এই সব নিয়ে কম ভাবেন নাই? এখন কি

রকম পরিস্থিতির মধ্যে কাটাচ্চেন জানতে ইচ্ছা হয়। কিছু কিছু অনুভব করি নিজেকে দিয়ে। আমার ভালবাসা নেবেন। ইতি

আপনাদের যামিনীদাদা

মৃণালিনী এসেছিলেন তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আপনার সঙ্গে জেনে সুখী হলাম। মিঃ এমার্সনের খবর কিছু পেলে জানাবেন। সেখানে ছবি বড় কম গেছে, এখানে ছবি সবই তৈরী হোয়েছে, সামনে পূজা তাই যাবার ব্যবস্থা করতে পার্চ্চিনা, আর বাঁধানোর খরচ ত কম নয় তবু বাঁধাতেই হ'বে যত দাম হয়, তবে পূজার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করব ইচ্ছা আছে যাই হোক পরের কথা পরে। গণেশের ছবি আপনি ২৫/৩০ই বলবেন যেমন বুঝবেন। হাঁসের ছবি যদি পছন্দ হয়, বিক্রী হোলে আপত্য কি? তবে তাঁদের বোলে দেবেন, চীনে শিল্পীর অনুকরণ। দাম ৪৫৲ টাকা বলবেন যদি সমীচীন মনে করেন। হরিণ বাঘ বেরাল, সব ছবিগুলি নূতন রকম কোরে আঁকা হোয়েছে দেখি পূজার পূর্ব্বেই পাঠাতে পারি কিনা।

আমার চিঠি খুব সম্ভব (আজ মঙ্গলবার), কাল বুধবার পাবেন, ঐ দিনই কি বৃহস্পতি পত্র দিলে শুক্রবার পাব, তবে ট্রেন লেট হোলে আর ঐ দিন পাবনা শনিবার পাব। বৌমার শরীর কেমন ইরা তারা কেমন জানাবেন। আপনার শরীর পূর্ব্বের চেয়ে ভাল কিনা জানাবেন।

১। ছেলেদের ছবি, ২। দেশী পট পুরাণ ও নূতন, আর ৩। আমাদের ছবি, প্রত্যেক রকমের ছবি ঠিক করা হচ্ছে, যাতে আলাদা আলাদা এক একটা প্রদর্শনী করা যায়।

কাপ্তেন আরুইন যদি এসে পড়েন তা হোলে যা ব্যবস্থা হতে পারে আর আমার সুবিধা অসুবিধা সবই জানালাম, এতে আপনার তাঁকে আনা বা না আনার বিষয় বিবেচনা করতে বোধহয় অসুবিধা হবে না। তবে সকলের উপর এই সময়ে আপনি সেখানে নানা অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন, এই সময়ে কোথাও যাওয়া আসার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা কোরে করবেন। আমার ভালবাসা নেবেন। বৌমা ও মেয়েদের আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি।

ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়
মঙ্গলবার
২২।৭।৪২

প্রিয়বরেষু

আজ আপনার চিঠি পেলাম, অল্পর মধ্যে চমৎকার। আমি বোধহয় অনেক কিছু লিখে কষ্ট দিয়েছি। এ সময়ে আত্মীয় বন্ধু যে যেখানে আছে সকলেই সকলকে উৎসাহ ও আনন্দ দেবার চেষ্টা করা দরকার মনে করি। মিঃ আরুইন আসতে চেয়েচেন এতেই মনে উৎসাহ খুবই, আর ওঁদের স্থানীয় অবস্থা ও ব্যবস্থাকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতাও আছে, আর সব চেয়ে একটা বিশেষ গুন পশ্চাতে স্থানীয় ব্যবস্থার নিন্দাও বাহ্যত করেনই না, মনে উদয় হ'লেও সেটাকে বিশেষ স্থান দেন না এই রকম আমার বিশ্বাস, তবে ব্যতিক্রম যে হয় না, তা বলছিনা। এই বিশ্বাসের জন্যই তিনি এলে সুখী ছাড়া অসুখী হইব না। সত্যিকারের সংস্কৃতি (যেটা এই যুগে ইউরোপে চলতি) আপনাদের মধ্যে আছে বলেই আপনাকেও এখানে আনবার সাহস করেছিলাম; আমার বিশ্বাস ভুল হয় নাই। আপনারা এখানে থাকাকালীন, সামাজিক প্রথামত আমি কিছুই করি নাই; তবু আমাদের মনে কোন বিশ্রী দাগ নাই। আপনারা এ সময়ে এলে সেখানের নানা অসুবিধা হ'তে পারে, তবে পূজার সময় আসবার জন্য আমি জানাতামই; এখনও তেলের টিন চাল সবই মজুত রেখেছি শুধু কয়লাগুলি খরচ হচ্ছে। অবশ্য আপনাদের আসা ও থাকার যে খরচা তার তুলনায় এগুলোর দাম কিছুই না, তবু খরচ করতে ইচ্ছা হচ্চে না। কেন তা জানি না। আপনাদের এখানে আসার কোন হাঙ্গামা আমার নাই, কারণ এখানে আমরা সম দুঃখী আপনিও বিদেশী আমিও তাই। বরং বৌমা থাকাকালীন আমিই বেশী সাহায্য পেয়েছি।

মিঃ আরুইন যদি আসেন, (সৈন্য বেশী হ'লেও এখানে কোন অসুবিধার কারণ নাই) থাকবার জন্য ডাকবাংলো, কিম্বা বসন্তদাদার বাড়ী খালিই আছে, থাকার জন্য একরূপ ব্যবস্থা হতে পারে। আর খাওয়ার ব্যবস্থা বাড়ীতেই রান্না কোরে, আপনার সঙ্গে কাঁটা চামচ আনা চাই, কারণ আমি জানি, এ গুলো না থাকায় ওঁদের এক রকম উপবাসেই কাটাতে হয়। আর যদি আপনি মনে করেন এখন থাক, তা হোলে সৈন্যবেশী ইংরাজের

যাতায়াতের অসুবিধা জানিয়ে বন্ধ করা। সবটাই আপনার বিবেচনার উপর নির্ভর, আপনাদের জন্য আমার কোন সুবিধা অসুবিধা প্রশ্ন নাই, আমাকে জিজ্ঞাসা না কোরেও আপনার সুবিধা মত যা ব্যবস্থা করবেন, আমি বিনা প্রশ্নে তাই মেনে নেব। কারণ আমার মনে মনে এই বিশ্বাস আছে, যা করেন আমার মঙ্গলের জন্য

[অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়

১।১০।৪২

প্রিয়বরেষু

গত কাল আপনার পত্র পেয়েছি আপনার শরীর আবার খারাপ হোল। শারীরিক আর মানসিক ঝন্ঝাটে সকলেই কাতর দেখছি। আপনি, দেবী, রাধারমণ বাবু আসবেন ভালোই তবু একটু আনন্দ পাব। আপনার কুনকে ইত্যাদি হস্তগত হোয়েছে। পটলকে চাদর আনতে বাঁকুড়া পাঠিয়েছিলাম, কারণ আপনাদের আগামী কাল মিঃ আরুইনকে নিয়ে এখানে আসবার কথা ছিল, আগে থাকতে সংগ্রহ কোরে না রাখলে, আপনারা ত মাত্র ২।১ দিন থাকতেন। পটল ফিরে এসেছে, ২। ১ দিন মধ্যে এসে পড়বে, তৈরী ছিল না তাই। কাঠের মূর্ত্তি সব গুলি বড় আর নিয়ে যাবার মত না, তাই দুদিন মিস্ত্রি লাগিয়েছি ঘোড়া আর পুতুলের জন্য। তবে মাটীর বড় মুখ (প্রতিমার) তৈরী হোয়ে আছে। খুব চমৎকার। সেটা আপনার জন্য। মিঃ সুরাবর্দ্দিরও একটা বরাত আছে, পরে তাঁর জন্য তৈরী করাব। বৌমা একেবারে নীরব কেন ? তিনি কি খুবই কাজে ব্যস্ত, শরীর কেমন জানাবেন। তাঁকেও পত্র দিতে পারি নাই, একটু রাগ করা উচিত এই জন্য। তাঁকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি, ইরা তারাকেও। আপনি আমার ভালবাসা নেবেন।

রমেন বাবুর আজ পত্র পেলাম। মিঃ আরুইনের তিনি খুব প্রশংসা করচেন চিঠিতে, তিনি অর্থাৎ আরুইন আমার এখানে আসবার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ কোরেছেন, আপনাদের সঙ্গে আসতে পারেন যদি ছুটী পান।

আমার ভালবাসা নেবেন। অশোকের পত্র পেয়েছি, দেখি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি। ইতি

আপনার
যামিনীদাদা

পুনশ্চ : আসবার সময় কিছু চা আনবেন। ভাল চা এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়
৩০।১০।৪২

প্রিয়বরেষু

গতকাল আপনার চিঠি পেয়েছি। ইরা তারা ছবিও পেয়েছি। আপনার হাতের ঘা এর জন্য খুব সাবধান হবেন, বড় বিশ্রী জিনিষ জংলী বিষ। গাড়ীতে বসে আর চিঠি লেখা হবে না, কলিকাতা যেয়েই চিঠি দেবেন, আপনার নিজের মোটামুটি সাংসারিক ব্যবস্থা। আসামে ত আরম্ভ হোয়েছে। কলিকাতা পৌঁছে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা আমাকে জানাবেন, আমার আর ভাল লাগছে না, যদিও ছবি আঁকতে মনটা বসেছে কিন্তু একলা আর পারছি না, যাওয়া চলে কি না আমায় জানাবেন। মিঃ স্থরাবর্দ্দি সাহেবের জন্য একটা কাঠের পুতুল ও প্রতিমার মাটীর মুখ পাঠালাম। আর আপনার বরাতি গামছা বড় = ১ জোড়া, ছোট ২ জোড়া, বেডকাভার ১টী, পুতুল ১০টী কুনকে ও ছোট কটরা মিলিয়ে···মোটা বোষ্টমীর ছবিখানি পটলের হাতে পাঠালাম। আরও অনেক জিনিষ পাঠাবার ইচ্ছা ছিল আপনার বৌদির যথা মিষ্টি ইত্যাদি কিন্তু হোয়ে উঠবে বোলে আমার মনে হচ্চে না, কারণ রজনীরা সকালের ট্রেনে গেল, তার জন্যে নানা উদ্বেগ পুতুলগুলি পুনরায় পটলকে রং কোরে দিতে হচ্চে খুব ব্যস্ত সে, কারণ ছুতার মিস্ত্রী এমন বিশ্রী রং কোরেছিল, কাজেই নূতন করে পটলকে করতে হচ্চে। আপনার ও মিঃ আরুইন, ও কল্যাণীয়া মৃণালিনীর জন্য আরও কিছু দেবার ইচ্ছা সত্ত্বেও এখনও ঠিকমত কাজ করতে পারলাম না, দেখি যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। মিঃ স্থরাবর্দ্দির জন্য যেমনটী দিলাম, ঐ রকম ও আরও বড় অন্য রকম করবার ইচ্ছা আছে, আরম্ভও কোরেছিলাম দেবার জন্য আপনার সঙ্গে।

মিঃ আরুইনের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়ই, আমার কথা জানাবেন, তাঁর আর একটা পত্র পেতে ইচ্ছা হয় আমার নমস্কার দিবেন। মিঃ স্ুরাবর্দ্দিকে আমার আন্তরিক নমস্কার আমার হোয়ে জানাবেন, ও বলবেন তাঁর জন্য কিছু জিনিষ পাঠাব, কিম্বা সঙ্গে নিয়ে যাব। মিঃ অরুণ সেনের (ব্যারিষ্টার) পুতুল এবার না দিলেই নয়, তাঁর জন্যও কিছু চাইই। বোষ্টমীর ছবি কোনটী ঠিক আপনি মনে কোরেছিলেন? মাত্র এই একটাই বোষ্টমীর বাঁধান ছবি ছিল, সেইটাই খুলে দিলাম, ঠিক এটাই কিনা, পটলকে অন্ততঃ জানিয়ে দিবেন। ট্রেনের সময় হোয়ে এল, মোটামুটি জিনিষগুলি পছন্দ হোল কিনা পরে জানাবেন। আমার ভালবাসা নেবেন, বৌমা ইরা তারা আপনি কেমন আছেন জানাবেন। এখানের খবর মোটামুটি ভাল। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

গামছা বড় ২ জোড়া—২৸০
বেড কাভার ১টী —৩৴০
বেড কাভার ছোট —২৶০
৭৸৶০

শ্রীশ্রীহরি

২৩।১০।৪৩
শনিবার

প্রিয়বরেষু,

এই মাত্র চিঠি পেয়ে আনন্দ ত পেলাম, কিন্তু আপনারও রক্তের চাপ কম, এবং তাতেই কষ্ট পাচ্চেন জেনে খুবই কষ্ট অনুভব কর্চ্চি, কারণ এর যে কি কষ্ট বুঝাবার না। অনেকখানি সঙ্কোচের সঙ্গে যেতে হয়, আপনাদের কাছে ট্যাক্সি কোরে। সে যাওয়াটা আমার খুবই লাগে, নিতান্ত টানে না যেয়ে পারি না। গত চিঠিটা লিখেই আবার একটা চিঠি লিখি মিসেস্ মিলফোর্ড ও মিঃ মার্শাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত টুকুর জন্য আমি দুঃখিত, তা আপনার কাছে জানাব, কিন্তু শারীরিক অবসাদের জন্য আর হোয়ে উঠে নাই, তবে ঐ টুকুর জন্য এই কদিন মাঝে মাঝে মনটা চঞ্চল হোয়েছে। আমি কারও সম্বন্ধে এ রকম ভাবি না। কদিন থেকে সাংসারিক নানা পীড়নে অত্যন্ত

দুর্ব্বল হোয়েছিলাম, এতখানি টাকা খরচ, খাওয়া পরার জন্য,—অভ্যাস নাই, তাই। এই অবস্থাটা বড় লাগছে ও খুব জখম হোয়ে পড়ছি—আপনারা ও ওঁরা সকলে মিলে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁদের সম্বন্ধে কোন ভালমন্দ ইঙ্গিত করার অধিকারও নাই করা উচিত মনে করি না। এটা পিউরিটান হবার বা দেখাবার জন্য না, সাধারণ ধর্ম্ম। আপনার চিঠি লেখা অনুকরণ যোগ্য এত চমৎকার লাগে অল্পর মধ্যে অনেকখানি, আপনি একটু সুস্থ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে আনন্দ পাই, মাঝে মাঝে দেখা পেতে ইচ্ছা হয় তাই লিখে জানাই।

আমি যদি দুর্ব্বলতার জন্য কোন কাজ ক'রে ফেলি, আপনারা সেটা ঢাকিয়ে চলেন এটা অনুভব করি। আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কও তাই। মার্শালদের টাকার জন্য আমি দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলেও আপনি নিশ্চয়ই সেটা অন্য ভাবে জানিয়েচেন, মনে করি; কারণ আপনাদের যামিনীদাদা টাকার জন্য চঞ্চল হোয়েছে এটা আপনাদেরই লজ্জার কথা। আর একদিন মিঃ মার্শাল ও মিঃ ডেনি এলে খুব সুখী হব। জনের খবরও অনেক দিন পাই নাই আশা করি তাঁর শরীর ভাল আছে। আপনার শরীর সুস্থ না হোলে আসার ব্যবস্থা করবেন না।

হাঁসের ছবিটা যে অবস্থায় ছিলো, দিতে মন সরে নাই, যতক্ষণ না পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করতে পেরেছি। সমস্ত ছবিটির ও ফ্রেমটির সংস্কার কোরে (খুব উজ্জল হোয়েছে এবার) রেখেছি, আজকাল ট্রামে বাসে বড় ছবি যাওয়া মুস্কিল তাই অপেক্ষা করছি একটা গাড়ীর।

দেবী দুদিন এসেছিল, গুরু শিষ্য সংবাদের মত লেখা আগেই আপত্য জানিয়েছিলাম, কিছু লেখার পর দেবী সেটা অনুভব করেছে, তাই অন্য ভাবে ছবি সম্বন্ধে যদি কিছু বলা যায় সেই কথা ভেবে দেখতে বলেছি।

আমি যদি একটু ভাল ছবি আঁকতে পারি যেমন আপনাদের গৌরব, সেই রকম আমিও গৌরব মনে করি আপনাদের কাজের মধ্যে। নানা দিকে দৈন্য না এলে চোখে দেখা জিনিষ কাণে শোনা জিনিষকে আবার ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়। এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা মনে হচ্ছে ভুলে না গেলে দেখা হোলে বলব। ছবি এঁকেছি অনেক আপনাদের ভাল লাগলে তবে আনন্দ। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

২৪।১।৪৪

প্রিয়বরেষু

সেদিন আপনি এসে শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন, তাতে আমি অনেকখানি বল পাই নিতান্ত প্রিয় জনের ভিতর দিয়ে সব কিছু পাওয়া এই বাইরে নিরাকারে আমার মন যেতে চায় না পারেও না, আমি এতখানি বাস্তববাদী হয়েও অবাস্তব ছবি আঁকি এই লীলা। গতকাল জন্‌ও সেই ভাবে এমন লোককে নিয়ে এসেছিলেন, যা আমার কোন দিন কল্পনাও ছিল না। জনের যে আমার উপর কত বিশ্বাস তা বুঝা গেল। **Mrs. R. H. Casey** কে নিয়ে এসেছিলেন। বৌমা খোকন ইরা তারা কেমন? ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

[৮/৪৪]

প্রিয়বরেষু

এই মাত্র চিঠি পেলাম, আমার কাছে আপনারা ক্রটী ও ক্ষমার বাইরে। দিনের পর দিন, নানা পরিচিত ও অপরিচিত দেশী বিদেশী বন্ধু জনকে নিয়ে এসে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেচেন, এত শীঘ্র যদি ভুলে যাই, এ চরিত্র নিয়ে কোন কাজই হবে না। তবে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একবার আলোচনা হওয়া দরকার আমারই স্বার্থ ও মঙ্গল দুইএর জন্য। আপনাতে না জানিয়ে, বা আপনার মত না নিয়ে জনকে নিশ্চয়ই লিখব না, জনকে পেলাম কোথা থেকে। আজ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে পত্র ব্যবহার যা হোয়েছে, তা অতি সামান্য কেবল কাজের কথাটুকু ছাড়া অন্য কিছু লেখার ক্ষমতার অভাব। মিঃ ফেভরি সম্বন্ধে খুব জোরের সঙ্গে বলছি, তিনি কোন ছবি আমার এখান থেকে কিনেন নাই। মিসেস কেসি আমার এখানে আসার জন্য কোন রূপ ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র পর্য্যন্ত দিই নাই, কারণ জন এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই, আপনার সামনেই জনের হাতে তাঁর ছেলেদের জন্য বোর্ড দিয়েছিলাম, তিনি চেয়েছিলেন বোলে, রং তার পর পাগল হোয়েছিল কোন পত্র না দিয়ে শুধু মাত্র রং মেশাবার পদ্ধতি লেখা কাগজ সঙ্গে ছিল। কাপ্তেন মার্শাল সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা তাঁকে বা তাঁর সঙ্গীদের খুব আপনার জন বোলেই মনে

হোয়েছিল, তাঁরাও সেই ভাবেই কথা কয়েছিলেন, সেই জন্যই বাড়ী তৈরীর কথা বোলেছিলাম—এখনও সব চেয়ে দরকারী মনে করি. এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দরকার আপনার সঙ্গে। ছবির স্থায়িত্ব ও কপি সম্বন্ধেও দরকারী কথা কইবার আছে এবার থেকে সকলকেই বলে দিচ্ছি, এর স্থায়িত্ব কম।

ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

শুক্রবার.

২২।৯।৪৪.

প্রিয়বরেষু

সেদিন একখানি পোষ্টকার্ড দিয়েছি, আমার শরীর মন ক্লান্ত চিঠি পর্যন্ত লিখতে ভাল লাগে না। এক রকম ভালই; কেননা আমার চিঠি প্রায়ই নাটুকে হোয়ে যায়, বিশেষ কোরে আপনার ও সুধীন্দ্রবাবুর চিঠির (সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণবন্ত) কাছে। আমার খুব ভাল লাগে। তাই বোলে আমার ধারা যে বদলাবে তার উপায় নাই অন্যদিকে যত সংযত হই, এই দিকে তত আলগা। আর কথার মারপেচও ভাল লাগে না, আপনার প্রবন্ধটীর জন্য যত পরিশ্রম ও উদ্বিগ্ন দেখি আমি সেই পরিমাণের ও বেশী লজ্জিত হোয়ে পড়ি। আমার জন্য আপনাদের অনেক কিছু করার অন্ত নাই। তার পরিবর্ত্তে আপনারা আমার কাছে কোন প্রত্যাশা যেমন রাখেন না, আমিও শোধ দেবার বাহ্যিক বা আন্তরিক চেষ্টা পর্যন্ত করি নাই। কেবলই গ্রহণ করে চলেছি। এ ঔদ্ধত্য কল্পনায় নাই। তবু এমনি হাওয়া আজকার গলদ হোয়েই পড়ে।

ডাঃ ষ্টেলা ক্রেমরিশের আর দেখাই পাই না, স্কেচগুলি কি সব প্রেসে, অথবা আপনাদের কাছে আছে জানি না, এ সম্বন্ধে একবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া বিশেষ দরকার সেদিন ওরিয়েন্টাল সোসাইটীর একজন সদস্য এর কাছে শুনলাম, তাঁরা আপনাদের প্রবন্ধ ও ছবিগুলি একটি পোর্টফলিও আকারে ছেপে বিক্রয় করতে চান, আমি কিন্তু ইহা জানি না, তিনি আমাকে বোলেছিলেন তাঁদের পত্রিকাতে ছাপার জন্য। আমাকে কিছু অর্থাৎ ২০০ খানা কোরে প্রত্যেক ছবি ও প্রবন্ধ দিবেন. সেটা আমি পোর্টফোলিও

আকারে রাখতে পারি। আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি ইহা আমার পক্ষে ছাপিয়ে বিক্রী করা ক্ষতিকর। এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে বিশেষ কোরে পরামর্শ করা দরকার শরীর মন ভাল থাকলে একবার আসতে পারেন ত ভাল হয়। আরও অনেক বিষয়ে কথা কইবার আছে। আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন। বৌমা ও ছেলেরা সকলে কেমন আছে? ইতি

আপনার যামিনীদাদা

৫।১২।৪৪

প্রিয়বরেষু

গতকাল পটলের হাতে বই-এর কভারের ছবি পাঠিয়েছিলাম, চিঠিও একটু লিখেছিলাম। সন্ধ্যার পর জনের চিঠি পেলাম। স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও চিন্তা, খুব কষ্টদায়ক, তাই সব গুছিয়ে লিখতে পারলাম না, আমার ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে যে কাজ যে চিন্তা আমার পরম উপকারী প্রিয় জনের মধ্যে বিভেদ ঘটায় তাহা পরিত্যাগ করাই আমি স্থির করিলাম। এবং এই সঙ্গে আমার জীবনের সবটাকেই নূতন কোরে আরম্ভ করার সময় এসেছে তাই আমার আপাতদৃষ্টিতে যতই ক্ষতিকর হোক ইহাই করিতে হইবে। আমি বরাবরই এই ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে এসেছি। জনকেও এই মর্মে চিঠি দিলাম। এই মনোগ্রাফ প্রকাশ, ইহা আমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে কারণ এই ব্যাপারে আমার মন এত উত্তেজিত হয়, ইহা সহ্য করা আমার স্বাস্থ্যের সামর্থ্য নাই। সোসাইটির চিঠি ও এগ্রিমেণ্ট ফরম ফেরৎ পাঠালাম। কোন লোভনীয় সর্ত্তে এ অর্থ আমি গ্রহণ করিতে পারি না, যেহেতু ইহাই আমার প্রিয়জনের ও পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে এর মধ্যেই বিভেদ ঘটিয়েছে তাহা আমার পক্ষে বজ্রতুল্য। দুদিনের এই (অত্যন্ত চঞ্চল) সাফল্য আমাকে মুগ্ধ করতে পারে নাই; এবং যে ঘটনায় ইহা আমাকে সচেতন করেছে, তার জন্য আপনাকে জনকে ডাঃ ক্রেমরিশকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আজও এই ঘটনা আমার মঙ্গলের জন্যই, ইহা হইয়াছে, আপনাদের কাছে লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাজে মৌখিক, সত্যি যদি কৃতজ্ঞ হই, ইহা অপ্রকাশ থাকিবে না।

আমার বাড়ীতে আগামী exhibition বন্ধ করিলাম আমার জীবন যাত্রার প্রণালী ভিন্ন রূপ হইবে, যাহা আজ পর্যন্ত চলিতেছিল।

সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত এই পুস্তক বন্ধ রাখিতে হইবে, তাঁরা বা যে কেহ ইহা করিবেন, আমার মৃত্যুর কারণ [অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

৯।১২।৪৪.

১/২ বি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

বাগবাজার

প্রিয়বরেষু

এই মাত্র সুন্দর, মধুর চিঠি পেলাম। চারি দিকের এমনি আবহাওয়া, যাদের কাজ' করতে হয় তাদের কতখানি সাবধানে চললে তবে কাজ করা যায় আপনি কিছু অনুভব করবেন, এই শরীর মন নিয়ে আমাকে যে পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টির কাজ করতে হয়, আমি যদি আরও অন্যায় কিছু করি, আপনাদের মত বা ভিন্নদেশীয় জনের মত হিতাকাঙ্ক্ষীর কিছুটা ক্ষমা পাবার দাবী করতে পারি। আমার কাজ যে বিপরীত ধর্ম্মী আজকার শিল্প ধর্ম্মীর পটভূমিতে, এটা আমি না বললেও চলে; তবে এই দৃষ্টিই যে আজকার দিনের পক্ষে একমাত্র উপযোগী কিংবা যা আঁকি তাই ভালো, এরকম মতিগতি আমার নয়, এ হলপ কোরে বলা চলে। আমার ছবিতে, ও আমার জীবন যাত্রার ভঙ্গীতে তা প্রকাশ হবে। আসল কথা এই দৃষ্টিভঙ্গী আমি মনে, প্রাণে, সম্ভবত সজ্ঞানে বিশ্বাস করি, ও এই আমার জীবিকা, ইহার উপরেই আমার বিশ্বাস প্রয়োগ করি। ইহাকে কথা করার জন্য আমাকে কত খানি প্রচেষ্টা করতে হয় আজকার চলতি দৃষ্টিভঙ্গীর যত বড় কর্মীই হন, হঠাৎ আমার কথাকে বা কর্মকে মেনে নেওয়া তাদের পক্ষেও মুস্কিল। আপনাদের ভুল বোঝবার রাস্তা গোড়াতে এমন ভাবে নষ্ট করা আছে যাতে আমার মনের মধ্যে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমি আপনাদের কোন কাজে, কোন কথা বিচার করি না, তাতে রসও পাওয়াই যায় না, বরং তিক্ত রস বেরুয়। উপস্থিত এই ব্যাপারে যে আমাকে যে আপত্তিজনক ব্যবহার করতে হল, সে শুধু মাত্র বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর খ্যাত-নামা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হওয়ায়, (বর্ত্তমানেই) যে কুফল তার থেকে, আমার দৃষ্টিভঙ্গীর কর্ম্মধারাকে বাঁচাবার আকুল চেষ্টা মাত্র। সামান্য কয়েক

মাসের জড়িত কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্যে কত অপ্রীতিকর চিঠি অপ্রীতিকর ঘটনা, এসব স্মরণ কোরে আমার কথার যথার্থতা আপনারা বিচার করবেন। এই ক বছরের আমার সাংসারিক ও সামাজিক জীবন ইহা আমি ক্ষণিক মনে করি ও একটু বিলাসযাত্রা। আমি শাকঅন্ন বিশ্বাসী, এখনও আমার এই শেষ সময়েও ভগ্ন স্বাস্থ্যেও এমন প্রবল বিশ্বাস আছে, যাহা শুধু মাত্র জীবন ধারণের জন্য আড়ম্বর শূন্য শাকঅন্ন সমস্ত দিন পরিশ্রম কোরলে যতই বিপরীত পরিবেশ হোক না তবু বাঁচতে পারা যায়, ইহা বিশ্বাস করি, এবং ইহাই আমার ধর্ম মনে করি।

জনকেও কাল চিঠি দিয়েছি। অনেক খানি লিখে আপনাকে ক্লান্ত করলাম, আপনার ও সুধীন্দ্রবাবুর চিঠি লেখার হিংসা করি, স্বভাবদোষ, ছোট কোরে লিখব চেষ্টা করলেও অনেক খানি বেড়ে যায়। বৌমা ইরা তারা খোকন কেমন আছে আমার আশীর্ব্বাদ জানাই। আপনি ভালবাসা গ্রহণ করবেন। কেশব মাধবকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

পুনশ্চ: জনের এই মাত্র আমার চিঠির উত্তর পেলাম, খুব খুশী হোয়েচেন চিঠি পেয়ে, কিন্তু শরীর অসুস্থ, তবু শীঘ্রই আসবেন, এখানে এ লিখেছেন।

ইতি যামিনীদাদা

আপনি কি জন, আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় যদি কখনও মনে সন্দেহ আসে, মনের কোণেও সন্দেহের ভাব আসে, তবে নিশ্চয় আমার সমস্ত কাজ একদিন নষ্ট হোয়ে যাবে। ছবির পেছনে আমার চরিত্র; তা যদি দুষ্ট হয়, লোহার পাতে উপর চিরস্থায়ী রংএ ছবি থাকলেও তার স্থায়িত্ব নাই। আমার এখনও বিশ্বাস, মুহূর্ত্তে যদি রং নষ্ট হোয়ে যায় যার উপর আঁকা হয় তার স্থায়িত্ব যদি দুই এক মাসেরও হয় তাতেও আমি নিজের বা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করি না, মুহূর্ত্তের আনন্দ যদি অপরকে অল্পক্ষণের জন্য দিতে পারি, তার পরিবর্ত্তে যে টাকা গ্রহণ করি তাহা অন্যায় মনে করি না, এই হেতু যে আজকার দিনে অল্পক্ষণের আনন্দের জন্য এর চেয়ে বেশী খরচ করেন। সকলেই।

তবে আমি যে সব বড় বড় কথা বলি, তাতে এটা মনে করবেন না, আমি গ্লানি শূন্য, ইহা যদি হয় তাহা দম্ভের কথা, তাহা হইলেও ধ্বংস অনিবার্য্য গ্লানি শূন্য অবস্থা। ⎴ চিত্রে বিন্দু, জীবনে=মৃত্যু, এই অবস্থা

গৃহীকে আনন্দ দেয় না, কিছু গড়তে গেলেই খাদ মেশাতেই হয়। যে গ্লানিতে অন্যের ক্ষতি করে না, ইহাই একমাত্র রাস্তা। সংসার ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে মোটামুটি এই ভাবে বলার চেষ্টা করি মাত্র।

আমার ত্রুটি, সোসাইটীর কাছে, আপনাদের কাছে স্বীকার করছি প্রথমেই আমার দৃঢ়তার অভাবের জন্য সকলকেই যে মনোবেদনা দিলাম, ইহা স্বীকার, ও ইহার জন্য দাম দেওয়া উচিত মনে করি। আবার অনেক কথা লিখে আপনাকে কষ্ট দিলাম। শুধু নিজেকে একটু হাল্কা করা ছাড়া এর অন্য ব্যাখ্যা নাই, আর লেখার ভাষা ও হরফ বিশ্রী আপনার কাছে এর জন্য লজ্জা নাই।

[একটা পাতা নকল]

কৃষক (চাষার — র মুখে — মর্ডান গদ্য পদ্য
সাঁওতাল (পোষাক — সাধু বাংলা — কেমন শুনায় ?
বাবু শ্রেণীর নীচের (নাচের — কতক্ষণ সে সুস্থভাবে
লোক — এই ভাষায় কথা বলতে পারে ?

বাহ্যরূপ

উল্টো

বাবুর পোষাকে বাবু কতক্ষণ
পুর্ব্বোক্ত সমাজের লোকের মুখের
ভাষা, কতক্ষণ সুস্থ ভাবে
বলে যেতে পারেন ?

শ্রোতারই বা কেমন
লাগে ? বাহ্যরূপের
সঙ্গে, ভাষার ধ্বনি
শ্রোতাই বা কতক্ষণ
সুস্থ ভাবে শুনে
যেতে পারেন ?

শ্রোতা = কতক্ষণ বাবু পোষাকে
সজ্জিত মানুষটির কথিত
সাঁওতালী, চাষীর ন্যায্য চলিত
ভাষা কতক্ষণ সুস্থ ভাবে
শুনে যেতে পারেন ?
শ্রোতারই বা কেমন লাগে ?
দুই এর বিরুদ্ধে সমাবেশ।

বাঙ্গলার = যে কোন ভাষা প্রতি ক্ষণ
যাকে বলতে হয়
(তা সাধুভাষা, কলকেতাই ভাষা,
গ্রাম্য ভাষা)
তার পক্ষে, ভিন্ন ভাষা ভিন্ন,
আচরণ সবার উপরে মানুষ
জীবের সব কিছু জন্মস্থানের
পরিবেশ জল হাওয়ায়

যা যা গড়া হয়
যা, যা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে

গৃহ, পোষাক, ভাষার ধ্বনি এই
মূল ভিত্তি। সব কিছু নির্ভর
করে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রা
আচার আচরণ সবই, মানুষের
রচিত, সব কিছুরই মূল

সেই মানুষটাকে ভিন্ন কথিত ভাষার—মানুষের কাজ—যথা ইউরোপীয় ধরনের ছবি আঁকা ঠিক মত হওয়া? কত ক্ষণ সে, নিজেকে সেই কাজে মন স্থির কোরে কাজ করবে, দর্শকই বা কেমন কোরে কতক্ষণ দেখবে? আমার নিজের কাজের ও চিন্তার মাঝে থেকে ভিন্ন শাখার সাহায্য এই ভাবে নিতে হয়।

[দুটো হাতির স্কেচ
একটা কাঠের ঘোড়ার]

শ্রীশ্রীহরি

৮।৩।৪৫

প্রিয়বরেষু

এই মাত্র ডাঃ ষ্টেলা ক্রেমরিশ এসেছিলেন, স্কেচগুলির জন্য বলাতে বললেন আমি কিছু জানিনা, আমি বললাম আপনার সই করা রসিদ আছে, বেশ একটু রেগে বল্লেন কাপ্টেন আরুইন জানেন। আমাকে বাধ্য হোয়ে একটু রাগতে হোল, (শরীরও ভালো নাই) শেষে বললেন ডাঃ রায় জানেন তাঁকে আপনি জানাবেন তিনি সেক্রেটারী, আমি বললাম রায়ের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই তিনি রেগে চলে গেলেন। এই ত' কলির সন্ধ্যে। এ সব ঘটবে, আমি জানতাম, সেই জন্য অনেক লিখেছি, যাই হোক এখনও অনেক বাকী। আমার শরীরও ভাল নাই। আমার ভাল করতে চেয়ে আপনাদেরও কম দুর্ভোগ হ'ল না আমার দুঃখ সেই খানে।

ইতি আপনাদের

যামিনীদা

শ্রীশ্রীহরি

৩।১।৪৬

১/২বি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

প্রিয়বরেষু

তিন দিন আগে চিঠি দেবার কথা, রেডিওতে আপনার দেওয়া কথা শুনেছি, যেমন গম্ভীর তেমনি সহজ, সংক্ষিপ্ত, আপনার চিঠি যেমন উপভোগ করি।, এইভাবে প্রকাশ কত যে শক্ত তা কিছু অনুভব করি, আমার কথা বোলেছেন বোলে যে আনন্দ, তার চেয়ে আনন্দ পাই আপনার প্রকাশ ভঙ্গীতে। তিনদিন খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম চোখের কষ্টর জন্য। আজ একটু সুস্থ। আগে লেখা উচিত ছিল, আজই ডাকে চিঠি দিতাম, কিন্তু এই ছেলেটাকে আপনার কাছে পাঠাতে হোল, তাই সঙ্গে এইটুকু লিখলাম। ছেলেটার নাম···প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হোতে চায়, আপনার কাছে পাঠালাম, কি উপায়ে হোতে পারে ব্যবস্থা করতে হবে। মিঃ চন্দকে কি বলার দরকার হবে? জানাবেন। ঠাণ্ডা পড়লে একদিন আসবেন। বৌমা ও ছেলেরা কেমন আছে জানাবেন। জনের কি আর কোন সংবাদ পেয়েছেন? আপনার শরীর কেমন জানাবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

মিঃ সুরাবর্দ্দির লেখা কপি পেয়েছি তার জন্যে কিছু ছাপবার উপযুক্ত কোরে স্কেচ করছি, কিছু তিনি দেখে গিয়েছেন, তাঁর খুব ভাল লেগেছে। বোধহয় আপনাকে জানাবেন। ইতি

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৫।৫।৪৬

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি ছোট্ট অথচ সম্পূর্ণ। আজ কাল আর না পারি বড় চিঠি লিখতে, না পারি এমনি ছোট্ট, অথচ সম্পূর্ণ চিঠি লিখতে। শরীর মোটেই ভাল না, আপনার শরীরও ভাল নয়; ইনফ্লোঞ্জা যে কি ভয়ানক তা নিজে ভুগেছি বোলেই বুঝতে পারি। সামনে সপ্তাহেই মার্টিনের ছবি পাঠাব। জনের চিঠিতে exhibition এর খোলার খবর পেলাম। ডেনীর স্ত্রীর চিঠি

ও ম্যাক উইলিয়ামের চিঠিতেও প্রথম দিনের খবর মোটামুটি পেয়েছি, সেখানের জন সাধারণ, শিল্পী ও সাহিত্যিক বিশেষ আগ্রহশীল। বিস্তারিত খবর পেতে ইচ্ছা করে, মার্টিন ও বৌমার ভাইএর চিঠিতে কি বিস্তারিত খবর কিছু আছে ? জনের আগ্রহ ও পরিশ্রম সফল হোলে আনন্দের কথা। মিঃ আর্চারের সাঁওতাল প্রীতি, ওঁদের রাজনীতি ক্ষেত্রে কিছু উপকারে লাগতে পারে। নৃত্য, চিত্রশিল্প, এর ক্ষেত্রে এই ভাবের বিশ্লেষণ খুব স্থবিধার মনে হয় না। আমিই একদিন যাব, এই রৌদ্র আর ট্রাম বাসের হাঙ্গামায় আপনি বেরুবেন না। স্থনীতিকে আপনার দেওয়া খবর পাঠালাম। বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে জানাবেন। ইরা তারার ছবি আঁকা চলছে নিশ্চয়ই। আমার কিছু ছবি চাই। ভালবাসা গ্রহণ করবেন।

ইতি

আপনার যামিনীদা

শ্রীশ্রীহরি

৬।৬।৪৬

১/২ বি আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন

প্রিয়বরেষু

আপনাদের দেখা পেলেই আনন্দ, ইহা মধুর সম্পর্ক। সেদিনের আসা ও যাতায়াতে খুবই কষ্ট পেয়েছেন, জল ঝড়ের জন্য। পটলের ও আমার, গত কাল সমস্ত দিন শরীর খুব খারাপ ছিল। বিষাক্ত খাবারের দরুণ বোধহয়। আজ খুবই দুর্ব্বল। রোদের তেজ কম থাকলে একদিন আস্থন। ইরা তারার ছবি আমার খুব ভাল লেগেছে, শিশুদের আঁকা ব'লে স্নেহ বসে না, ইহা কেবল আমার জন্যে দরকার এই জন্যেই। অন্যে ইহা অন্যভাবে ব্যবহার করলে, শিশুদের প্রতি ও এই ছবির প্রতি অপব্যবহার দোষে দুষ্ট হবে। বৌমা এসেছিলেন অথচ সেই সময়ে আপনার বৌদিদি বাড়ীতে ছিলেন না, এর জন্যে তিনি খুব চঞ্চল হোয়েছিলেন। ইরা তারা খোকনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। ইতি

আপনাদের যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১২।৮।৪৬

১/২বি আনন্দ চাটার্জ্জি লেন

প্রিয়বরেষু

বইখানি পড়ে খুব ভাল লেগেছিল, তখুনি জানাতে ইচ্ছে হোয়েছিল ডাক বিভ্রাটে হোয়ে উঠে নাই। আপনার ভাষার যে একটা বিশিষ্ট রূপ, গতানুগতিক থেকে পৃথক হবার উৎকট চেষ্টাও নাই অথচ পৃথক এবং সংযত, খুবই ভাল লাগ্‌ল। মন ও কাজ দুই-ই সংযত কোরে কিছু কাজ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, বিরুদ্ধ পরিবেশ প্রবল বাধা, হয়তঃ এতে কাজ জোর পাওয়া যেতে পারে, যাই হোক এরই মধ্যে কিছু কাজ যদি করতে পারি তবেই স্বাস্থ্য ও মন দুই ভাল থাকতে পারে। বৃষ্টি বাদলায় শরীর মোটেই ভাল থাকছে না। জনের চিঠি আর পাই নাই, সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকি : আমাকে কেন্দ্র কোরে যদি আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয় তাঁকে, তবেই অত্যন্ত দুঃখের কথা হবে। ভালবেসে কিম্বা ভুল কোরে আমার উপর যে বিশ্বাস আপনাদের, তাহা ব্যর্থ হোতে না দেওয়াই আমার পরবর্ত্তী জীবন এবং কাজ ও ধর্ম্ম। কল্যাণীয়া বৌমা ও ছেলেমেয়েরা কেমন আছেন। আপনার শরীর কেমন জানাবেন। ইতি

আপনাদের যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২।৯।৪৭

১/২/১ আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, বাগবাজার

প্রিয় বরেষু,

শরীর যে আবার সুস্থ হবে, তা আর মনে হয় না। শরীর অসুস্থ, এই অজুহাতে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, কিম্বা আপনাদের আহ্বানে না যাওয়ার মনোবৃত্তি আমার কোন দিনই নাই। বরং দেহটা যত পঙ্গু আর পরাধীন হচ্ছে বাইরে বেরুবার ইচ্ছাটা তত প্রবল হ'চ্ছে, এর জন্য মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়। সেদিনও না যেতে পেরে খুবই লজ্জিত হোয়েছি। খুব দুর্বল এখনও, রক্তের চাপ কম, স্নায়ু দুর্বল, এর যা কষ্ট প্রতিদিনই ত ভোগ করি ; যার জন্য প্রায় পঙ্গু অবস্থা। তার উপর কিছুদিন থেকে হার্নিয়ার মত

যাহোক কিছু একটা হোয়েছে যাতে খুবই দুর্বল বোধ করি, দু এক দিন মধ্যে একবার এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাব।

কিছু দিন থেকেই,—আপনাদের চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেই এত সমস্যা ও তত্ত্ব কথা বন্যার মত এসে পড়ে যা গুছিয়ে লিখবার ক্ষমতা নাই অথচ না লিখেও মুক্তি নাই, বোধহয় এই ভাবে কিছু বেরিয়ে না গেলে ফেটে যেতাম। জানি, এ ভাবে লেখার বা বলার কোন সার্থকতা নাই, তবুও লিখি, বা বলি। আপনাদের সঙ্গে দেখা হোলে অনেক কথা বলে খানিকটা বিরক্ত করি। চিঠির বেলায় কিন্তু লিখে আর ডাকে দিইনা আজকাল, আপনাদেরও দুর্ভোগ কমে, চিঠি পড়ার।

রাষ্ট্র, রাজনীতি, নেতা-দেশ-সংস্কৃতি, প্রকৃতি চিত্র শিল্প সাহিত্য, যা গত ও যা চলছে, তা থেকে এবং নিজের কর্ম্মের উপর তার প্রতিক্রিয়ায়, কাজ ও চিন্তায় এত একলা, প্রায় একঘরের অবস্থা। সামাজিক জীবনে দণ্ড স্বরূপ একঘরের ব্যবস্থা ছিল। চলতি শিক্ষিত সমাজের চিন্তা ও কর্ম্মধারার ব্যতিক্রম করা ইহার জন্য ত দাম দিতেই হয়। গত দু বৎসর থেকে ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনেও তাহা প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা কোরেও ব্যর্থ হচ্ছি তার জন্যেও দাম দিতে হবে। বয়স ও স্বাস্থ্য পীড়া দিচ্ছে বেশী কোরে। অনেক কথা লেখার ও বলার থাকে যতক্ষণ না হওয়া যায়, হোয়ে গেলে কথা লেখার দরকার হয় না। আর বেশী লিখতে গেলে এ চিঠিও যাবে না। এই চিঠিটাই দুদিন ধরে লিখছি। আজ ডাক্তার আসবে, দেখি কি বলেন। গতকাল মিসেস কেসির চিঠি পেলাম। কলিকাতার গবর্নমেণ্ট হাউসটাকে ছবি সংক্রান্ত জিনিষের ও ছবির পীঠস্থান (মিউজিয়ম ও গ্যালারী) করার ইচ্ছা (কামনা) জানিয়েছেন, আমাদের চেষ্টা করার জন্যও অনুরোধ করেছেন। জনের চিঠি কি পেয়েছেন? আমি বহুদিন আর কোন চিঠি পাই নাই। যাই হোক আমি কামনা করি তার মঙ্গল হোক ও বিবাহিত জীবন আনন্দের হোক। মার্টিনের চিঠি নিয়মমত পাই। উপস্থিত কল্যাণীয়া বৌমার, ইরা তারা, খোকন, সকলের স্বাস্থ্য কেমন জানাবেন। আমার শুভকামনা ও আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আপনার স্বাস্থ্য কেমন জানাবেন। আপনার বৌদিদি ক্লান্ত ও অসুস্থ বাড়ীর সকলেই প্রায়। বর্ত্তমান এক বৎসরের হত্যালীলা রাজনীতি ও নেতা, বক্তৃতা, বাণী, (স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে, নেতাদের নূতন আবিষ্কৃত শব্দ, ও স্বাধীনতা পাওয়া, সব ঠিক ঠিকই ঘটছে, ইহার অন্যথা হবার নয়।

যখন ঘটছে নিশ্চয়ই ইহার দরকার ছিল ও আছে। আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন। ইতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২১।৩।৪৭

১/২বি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

বাগবাজার

প্রিয়বরেষু

আপনার বৌদিদি, বৌমার চিঠি পেয়েছেন, মণ্টু ছিল না, গতকাল এসেছে, তাই চিঠি দিতে দেরী হ'ল। মণ্টুদের বাড়ী একমাসের জন্য ভাড়া হোয়েছে। যিনি ভাড়া নিয়েছেন, তিনি আর বেশীদিন থাকবেন কিনা? যদি আর বেশীদিন না থাকেন মে মাসের জন্য, আর কাউকেই দিবেন না আপনাদের জন্য থাকবে, এই মর্ম্মে সেখানের মালীকে আজই লেখা হোল, যদি তাঁরা মে মাস পর্য্যন্ত থাকেন, অপর বাড়ীর জন্যও তাকে লেখা হোল সে লোকটা আরও ২।৪ খানা বাড়ীর তদারক করে। দুদিন হোলো জনের বিয়ের কার্ড পেলাম, কার্ডের আঁকা সাজনটী দেখে সারা ইউরোপকেই দেখা যায়। বিভ্রান্ত। মঙ্গল, শান্তি, শুভ, কোন রসই দেয় না, এত·শুধু বিভ্রান্ত—তবু একটী যা হোক কিছু—আমাদের দেশের এই রকম কাজের জন্য, যথা সরস্বতী পূজার কার্ড—বিয়ের কার্ড=সভাসমিতির ইত্যাদি সে আবার না কটু না তিক্ত না মিষ্টি। মাটী হাওয়া জল এদেশ থেকে সব কিছু চলে গেছে। যা কিছু ছিল কণ্ট্রোলের বাজারে উধাও হোয়েছে, এই কালো বাজারে থাকা যে দায় হোলো। ইরা তারা খোকনকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। বৌমাকে আমার শুভকামনা জানাচ্ছি। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

৺বিজয়া দশমী

প্রিয়বরেষু,

আমার শুভ কামনা গ্রহণ করবেন, কল্যাণীয়া বৌমা ও ইরা তারা খোকনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।

সাহিত্যপত্র এই সংখ্যাও পেয়েই, বারবার পড়েছি। এইটুকুর মধ্যে লিখে

সবটুকু প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নাই। চোখ এবং কান দুই অবিশ্বাসী, ইন্দ্রিয়। এবং ইহাই এই দুই ইন্দ্রিয়ের গুণ। এই গুণ না থাকলে মায়ার ফাঁদে প'ড়ে না, মানুষ, ও সৃজনও হয় না। গুণাগুণ বিচারের ভার অপরের, আমি শুধু বার বার পড়ে এইটুকু ধরতে পেরেছি, সন্ধি কাটিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনি, (ছবিতে প্রবন্ধে কবিতায়) ইহা সঙ্কলন নয়, এবং রসাভাস দোষে দুষ্ট নয়। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

যামিনীদাদা

তবু দু এক যায়গায় চিহ্ন রয়েছে। গল্প দুটীর মধ্যে গ্রাম্য কথা, গ্রামের লোকের মুখে যা বলান হোয়েছে তা যখন ঠিকমত বলান যায় না, ১৯৪৮-এর লেখকের কলমে, এবং সম্পূর্ণ ভাষাভঙ্গীও জানা নাই, লেখকদের তা না বসালেই ভাল বোধ হয়। ইতি

যামিনীদাদা

পুনশ্চ প্রথম প্রবন্ধটার জন্য ধন্যবাদ জানাই, সামাজিকতা রক্ষা করা মাত্র, ধন্যবাদ জানাবার সম্পর্ক আপনার সঙ্গে নয়। ইতি

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

৮।৩।৪৮

১/২ বি আনন্দ চাটার্জ্জি লেন

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পেয়েই, আপনাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ কোরেছিলাম, এই কদিনে ৪ খানা চিঠি লিখে ঠিক মত হ'লোনা, এমনি মানসিক অবস্থা কিছুতেই বর্ত্তমান সভ্যতাকে মেনে নিতে পারি না, এমন ক্লান্ত হোয়ে পড়ছি, অন্তরে বাইরে কোন রূপ আনন্দ খুঁজে পাই না, শুদ্ধ আনন্দ ত কল্পনার বাইরে, এই পরিবেশে।

কেশবের মৃত্যু সংবাদে আমি খুবই ব্যথা পেয়েছি, সেদিন আপনাকে ক্লান্ত দেখালেও আপনার চিঠি আমাকে মুগ্ধ করে, আপনার গতিভঙ্গী ও লেখা চিঠি টুকুর মধ্যেও যে সংযম ও সুষ্ঠু নাগরিকের লক্ষণ দেখতে পাই তাহার জন্য আমি হিংসা করি।

আপনার কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যেও এই গুণ বর্ত্তমান।

"সন্দীপনের চর" ['সন্দীপের চর'] বইখানি দুবার কোরে পড়েছি পরস্পরের কাজের সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া খুবই দরকার মনে করি সমাজ গোষ্ঠী ত এই জন্যই আমার অধিকার নাই লেখার ; আপনাদের কাছে আমার কোন লজ্জার বালাই নেই আপনাদের ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা ভাবি নাই, সেই অভ্যাসের জন্যই চিঠি লেখার সময় কিম্বা দেখা হোলে নানা আলোচনায় অধিকার ছাড়িয়ে যাই।

আজ আর বেশী লিখতে গেলে এই চিঠিও যাবে না, পরে লিখব নিশ্চয়ই। একদিন দেখা পেতে ইচ্ছা হয়। একটু সুস্থ হোলেই আমিই যাব।

ইরা, তারা, খোকন কেমন আছে ? বৌমাকে আমার কথা জানাবেন। আমার শুভকামনা জানাচ্ছি। আপনি কেমন আছেন জানাবেন। ইতি

আপনাদের

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২৭।১০।৪৮

১/২/বি আনন্দ চাটার্জি লেন বাগবাজার

প্রিয়বরেষু

গত কাল আপনার চিঠিটা পেয়ে তৃপ্তি পাইলাম, আপনার শরীর মন সুস্থ থাকুক এই কামনা করি। আপনি যে আমার শরীরেরর ও মঙ্গলামঙ্গলের জন্য ভাবেন তা অনুভব করি। এবং আপনার মত দুএকজনের এই কামনার জোরেই বেঁচে আছি। আমার একমাত্র সম্বল, ও কার্য্য, মানুষের এই শুভ ইচ্ছা। লেখবার অনেক কথা আছে, বলারও আছে, তার সঙ্গে যদি কাজও কিছু করতে পারি, তার জন্য এখনও আন্তরিক ইচ্ছাও আছে। তবে দুর্ম্মতি-পরায়ণ রাষ্ট্র পালদের (গোরুর পাল) হাতে প'ড়ে যত দুর্গতি বাড়ছে, মনের মধ্যে জোর তত পাই কিন্তু এমন কোরে পেটে মারছে যে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। ইহা আমাদেরই কৃতকর্ম্মের ফল, ইহার জন্য গত ও বর্ত্তমান বংশীয় প্রত্যেকেই দায়ী। গোরুর পালরা তো আমাদেরই প্রতিরূপ।

ইরা তারা বড় হোয়েছে তারা ত ছবি এখনও আঁকছে নিশ্চয়ই তাদের আঁকা ছবি কিছু চাই। রিখিয়াতে কি নিরোদদের [নীরদদের] বাড়ীতেই

রয়েছেন ? বৌমা, ইরা, তারা, খোকন, কেমন আছে, সকলে একটু আনন্দে থাকুক এই কামনা করি, আনন্দের বড়ই অভাব। আর কতদিন ওখানে থাকা হবে জানাবেন। চঞ্চলকে চিঠি দিয়েছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই। বৌমার ভাইটী কি কলিকাতাতেই আছেন, বড় ভাল লাগে মাঝে মাঝে এলে সুখী হই।

আপনার লেখার মধ্যে এত সংযম, মুগ্ধ হই।

আমার শুভ কামনা জানাচ্ছি কল্যাণীয়া বৌমাকে ছেলেমেয়েদের আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। আপনি আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

২৯।১০।৪৮

প্রিয়বরেষু

আকাশ মাটী হাওয়া সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সব মিলিয়ে যে প্রকৃতি মাটীতে যা সৃষ্টি হয়েছে হচ্ছে, তার মধ্যে যে এই চোখ দিয়ে দেখা যায়, সাপ বাঘ কত বিষাক্ত ফল গাছ, তার শিকড় এর যে ভয়ানক গুণাগুণ তা কি কেউ রোধ করতে পারে এই প্রকৃতির সৃষ্ট মানুষ জীব—এরও যে কত গুণাগুণ তাও অনন্ত যে সাপের বিষে ক্রিয়ায় মানুষ জীব মুহূর্ত্তে প্রাণ হারায়, সেই বিষই মানুষের প্রাণ দেয় যে কুচলে ফল মহা বিষাক্ত সেই ফল থেকেই মহা ওষুধ মানুষই আবিষ্কার করেছে। [অসমাপ্ত

২৮।৫।৪৯

১/২বি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

বাগবাজার

প্রিয়বরেষু

আমি জানতাম আপনি পুরী গেছেন, সেদিন চঞ্চল এসেছিল, তার কাছে শুনলাম, আপনার যাওয়া হয় নাই, রোজই চিঠি দোব মনে করি,

এমনি পরিবেশে পড়েছি তাও হোয়ে ওঠে না। নিজের দিকে চাইলেই সব সমস্যা সমাধান হয়। সব সময়ে তা পারি না, তাই কষ্ট পাই।

হয় দেখা সাক্ষাৎ, নয় চিঠি, দুটোর মধ্যে একটা না হোলে, থাকি কি নিয়ে! খাওয়া, বসা, শোয়া, আর কাজের মাঝে নানা সমস্যার কথা, মনে আসে, সমাধানও পাই তবু পূর্ব্ব অভ্যাস, রক্ত মাংসের দেহ মন, এর থেকে নিষ্কৃতি নাই।

আমি চিঠি লিখতে বসলেই বড্ড বেশী লিখে ফেলি, আপনার সংযত চিঠি ঈর্ষার বস্তু, তবে যার যা স্বভাব, ইচ্ছা করলেই হওয়া যায় না।

এবারের সাহিত্য পত্র কয়েকবার পড়েছি, আপনার প্রবন্ধও দু-তিন বার পড়েছি, কাছেই রয়েছে আবার পড়ছি, বৌমার দাদামশায় ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নব্য ভারতের প্রথম সংখ্যার ভূমিকা, বসুমতীর পুরাতন সংখ্যায় পড়লাম, সেইটাও কাছেই রয়েছে এক সঙ্গেই পড়তে আমার খুব ভাল লাগছে। মিঃ আর্চার ও মিঃ এলউইনের সম্বন্ধে যা লিখেচেন, তথ্যের দিক থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়, কিন্তু তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক থেকে নিষ্ফল বলতেই হবে। তবে যখন দুর্ভাগাদের, আমাদের সংস্পর্শে আসতেই হচ্ছে, ফলাফল যাহাই হোক, ইহাই লিখন। ইহারও দরকার আছে, স্বীকার করতেই হবে, যখন ঘটছে। কত কথা যে মনে আসে আবার মিলিয়ে যায় মনে, আপনাদের কাছে, আমার গণ্ডীর বাইরেও অনেক কথা বলি। সামাজিকতা ও নাগরিকতাও কি কম বন্ধন! ভারতবর্ষ, তার মধ্যে বাঙ্গলা দেশ এই বাংলার মধ্যে কলিকাতা নগর, পরিকল্পনা ইংরাজের, এত বড় বিজ্ঞানী ও গড়নদার হ'য়েও মাটী চিনতে পারেন নাই এ মাটীতে ও গড়ন করা উচিত ছিল তবে ইহাও দরকার ছিল ব্যর্থতাই জ্ঞানের রাস্তা।

সেদিন চঞ্চল, রথীন, রমেন বাবু এসেছিলেন, চঞ্চলকেও চিঠি দিচ্ছি।

বৌমা ইরা, তারা, খোকন সকলে কেমন আছেন জানাবেন। আপনার শরীর কেমন আছে? আমি ক্লান্ত। ইতি

আপনার

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৭।১।৫০

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

কলিকাতা-১৯

প্রিয়বরেষু

কি ব্যবহারের জন্য কাঠ, কি পাথর, কি মাটী কিবা রং কোন বস্তু দিয়ে মানুষের কোন ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু তৈরী করা হবে এ জ্ঞান প্রথমেই দরকার মানুষ প্রথম কাঁচা মাছ মাংস, ফল খেতো ২য় স্তরে অগ্নি সংযোগে পুড়িয়ে তার পরের স্তরে লবণ মশলা দিয়ে পাক করা =

অঙ্গের আচ্ছাদন—

প্রথমস্তরে উলঙ্গ

দ্বিতীয় স্তরে গাছের পাতা

তৃতীয় স্তরে সুতা তৈরী কোরে নানা গড়নের অঙ্গের আচ্ছাদন তার উপর রং কারুকার্য্যই হাত পাকা করা = ছবি – মূর্ত্তি ও [অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

২৩।৫।৫০

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ প্লেস

প্রিয়বরেষু

সেদিন রাত্রির দুর্য্যোগে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে প্রথমেই পটলের কাছে বকুনি খেতে হ'ল, সকালেই পটলকে পাঠাব ইচ্ছা ছিল, তাও যখন হ'ল না চিঠি লিখব, মনে করলাম, মনে করতে করতে আজ পর্য্যন্ত এসে পৌছল, আমার যে কি হোয়েছে, চিঠি লিখতে একেবারে ইচ্ছা হয় না, কিসের উপর বিরাগ জেনেও জানি না। সেদিন মিঃ টারনারের সঙ্গে কথা ক'য়ে মোটেই তৃপ্তি পাই নাই, হলুদ আর চুণ মিশালে মেটে-লাল হয় ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য, তেমনি এদেশে থাকলে আর পণ্ডিত হ'লে যা হয়! বাঘের বাচ্ছা বাঘ হ'লে দেখতে ভালই হয়। ইহা ব্যক্তিগত আক্রমণ নয় তাঁর উদ্দেশ্য সৎ মানুষও সৎ। কিন্তু পরিবেশ। শুভকামনা জানাচ্ছি। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২৪।৩।৫১

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু =

কদিন থেকেই আপনাকে লিখব মনে কর্চ্চি, যাওয়াও হচ্ছেই না। নিজেঁকে অপরাধী মনে করি এর জন্য। আজকাল বিশেষ কোরে, আগেও যে ছিল না তাও নয়, বেশী বলা, অনেক সময় সেই ফাঁকে নিজের প্রশংসাও বেরিয়ে যায়, ইচ্ছা করি যাতে কথা কম কাজ বেশী হয়। আপনার চিঠি, কথা, ও ব্যবহার কত কম উচ্ছ্বাস, অথচ আন্তরিকতায় ভরা। আজকাল চারিদিকের ঘটনায়,—লেখা, ছবি, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, সংসারজীবন সব কিছুই এমন বিসদৃশ মনে হয় অস্থির হোয়ে পড়ি। এখন ৫৫ বৎসরে লোকে পেন্‌শন্ পায়, আগের যুগে পঞ্চাশের পর বানপ্রস্থ। আমার কি এই বয়সেও নিষ্কৃতি নাই এখনও পুরাদমে সংগ্রাম, মাঝে মাঝে ক্লান্ত হোয়ে পড়ি, ক্লীবত্ব আসে। ক'দিন ধরে শরীরটা খুবই খারাপ চলছে। আপনারা সকলে একটু আনন্দে ও সুস্থ থাকলে সুখী হই।

কল্যাণীয়া বৌমার নিমন্ত্রণ চিঠি পেয়েছি, শরীরটা একটু সুস্থ থাকলে যাবার ব্যবস্থা করব। ইরা, তারা, খোকনকে আশীর্ব্বাদ জানাই। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২০-২১।৪।৫১

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

এবার, অনেক দিন পর আপনাকে দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছি। শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই, কোমরের ব্যথা কিছুতেই কমছে না, ডাক্তার দেখান হচ্ছে সহজে যাবে ব'লে মনে হ'চ্ছে না।

এবারের ছবিগুলি, বন্ধুদের ভাল লেগেছে কিনা জানাবেন।

নানা অসুবিধা, বিশেষত এই দেশে এই দেশের চিত্রশিল্প যাহা তাহারই সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল, তাহাকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধায় (বিদেশী সভ্যতার নকল করতে যেয়ে) তিনশ বৎসর ইংরাজ রাষ্ট্রের ও হাজার বৎসর মুসলীম রাষ্ট্রের, আওতায়, অপাঙ্‌ক্তেয় কোরে রেখেছিল। এই দেশের চিত্র শিল্পের ধারাও প্রায় শুকিয়ে গিছল আর ইউরোপীয় শিল্পের ধারাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে নাই আজও পর্য্যন্ত। আমাকে এই সমাজের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, নানা ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক।

এই টুকু দুদিন ধরে লিখেছিলাম, শরীরের এমন অবস্থা। গত কাল আপনার দেড় শত টাকার চেকটা পেলাম, শুধু চেকটা, সঙ্গে একটু লেখা থাকলে আনন্দ পেতাম। যাই হোক, ছবিগুলি, আপনার ও আপনার বন্ধুদের একটু আনন্দ দিলে সুখী হইব। আপনার সঙ্গে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, সেখানে, বাইরে দেখান ভব্যতার স্থান নাই, তাই আপনার কাছে আমার কোন সঙ্কোচ হয়না, [অসমাপ্ত

১৬।৫।৫১

১৬ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু

আরও ৫ খানি ছবি হোয়েছে আগামী কাল কি একবার গাড়ীটা আনতে পারবে ? বাকী তিন খানি শনি রবিবার হোয়ে যাবে। কিমার কোংতে যিনি কাজ করেন, তিনি কি আপনার বাড়িতে এর মধ্যে এসেছিলেন ? তাঁর কাছে একখানি ছবির দাম পাওয়া যাবে, যদি তাঁর অসুবিধা না থাকে এ সময় পেলে ভাল হয়। দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন ত কলেজ বন্ধ রয়েছে মাঝে মাঝে এলে একটু আনন্দ পাব। কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার শুভ কামনা জানাচ্ছি। ইরা, তারা, খোকনকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। আপনি প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

আপনাদের

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২৩।৭।৫১

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

সকালে পাঠাতে পারলাম না শরীরটা কিছুদিন থেকে বড়ই গোলমাল করছে ক্লান্তও করেছে। ছবি দুখানি পাঠালাম, কোন রকমে শেষ করেছি, আপনার ভাল লাগলে সুখী হব। একটি এক রঙ্গে ছাপা হবে, রংটা ক্রোম ইয়োলোর সঙ্গে একটু লাল, একটু কাল মিশিয়ে রংটা তৈরী কোরে নিতে হবে। সেই রঙ্গে জমিটা ছাপা হ'লে তার উপর এই ব্লকটা ছাপলে, এই রকম দেখতে হবে আশা করি। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা জানাবেন। আশাকরি ভাল আছেন। কল্যাণীয়া বৌমা, ইরা, তারা খোকনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাই। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৪।১০।৫১

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

৺বিজয়ের শুভকামনা আপনি গ্রহণ করিবেন। কল্যাণীয়া বৌমাকে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। ইরা, তারা খোকনকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। গত কাল আপনার চিঠি খানি পেয়ে পরম তৃপ্তি পেলাম। তারার স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হবারই কথা, ওখানে এখন কাঁচা বেল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কাঁচা নরম বেলকে চাকা চাকা করে কেটে সিদ্ধ কোরে চিনির রসে একটু ফুটিয়ে নিলে চমৎকার সুস্বাদু মোরব্বা হবে রোজ সকালে দুটো কোরে খেলে অনেকটা উপকার হবে, কাঁচা মুগ জলে ভিজিয়ে আঁকুর বেরুলে তাই অল্প কোরে সকালে খেলে ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হয় সকালে অন্য কিছু না খেয়ে মোরব্বা ২টো আর মুগ ভিজান কিছু, তেঁত কিছু যে কোন রকমে সকালে

খাওয়ার আগে। দুপুরে মাটা ডাল, ভাত, তরকারী। দুগ্ধ খাওয়া, পরিচ্ছদ, ওর ধাতুতে সহ্য হবে না, ছবির ভিতর দিয়ে ওর মনের ভিতরের টান বুঝা যায় আজকার দিনে ওর বয়সের ছেলে, মেয়েরা—আহা মরি ছবি আঁকে। তারা কেমন থাকে জানাবেন। পূজার কয়েকদিন আগে থাকতে ইন্‌ফ্লোঞ্জায় শয্যাগত ছিলাম, এখন বেশ সুস্থ হই নাই। আপনার শরীর মন কেমন আছে জানাবেন। এ বাড়ীর খবর মোটামুটি এক রকম চলছে।

ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

৯।১২।৫১

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয় বরেষু

গত কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশ উৎসাহ ছিল, তারপর থেকে কোমরের ব্যথায়, উঠা বসা কষ্টকর মনে হওয়ায়, তিথিটী একাদশী জানতে পারলাম, ঐ অবস্থায় যাওয়া বিপজ্জনক, তাই যেতে পারি নাই, কোমরের ব্যথা ও মনের ব্যথা দুই কষ্টকর। শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্য একবার যেয়ে চলে আসাও অভদ্রতা মনে করি। শম্ভুবাবুর কাছে আমার এই প্রতিবারের ত্রুটীর জন্য অত্যন্ত লজ্জিত। আমার অবস্থা আপনি অনুভব করেন, তাই আপনাকে লিখলাম। আপনার শরীর কেমন জানাবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

৩০।৯।৫২

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু=

আপনাকে ৺বিজয়ার শুভকামনা জানাচ্ছি। কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। ইরা, তারা, পপাকে আশীর্ব্বাদ করছি। দুদিন আগে

একখানা পোষ্টকার্ড দিয়েছি, বোধহয় পেয়েছেন। আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। পটল কাল পরশু মধ্যে এসে পড়বে। বাড়ীর অন্যান্য সকলে একরূপ ভাল আছে। আপনারা একটু আনন্দে থাকুন এই আন্তরিক কামনা। এবারের সাহিত্যপত্রে পতঞ্জলি রায়ের প্রবন্ধটী পড়ে খুবই উত্তেজিত, হ'য়ে পড়েছিলাম, প্রবন্ধে ভূমিকাটী পর্যন্ত পড়ে আর ইচ্ছা করছিল না বাকীটা পড়ি, পাছে এই চরম কথার পর অন্য কথা এসে পড়ে—পরে অবশ্য পড়েছি। প্রজ্ঞানভায়ার কাছে পতঞ্জলি রায়ের খোঁজ তখনই করলাম, প্রজ্ঞানও জানত না, পরে খবর নিয়ে বোধায়নকে সঙ্গে নিয়ে এল। ঐ চরম কথা পর বাকী কথাগুলির কোন দরকারই ছিল না মনে হয়, যাই হোক আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার মতামত কি জানাবেন। বোধায়নকে আমি খুবই প্রশংসা করেছি অন্তরের সঙ্গে। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১১।১০।৫২

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু—

আপনার পোষ্টকার্ডটী পেয়েছি। একটু লেখার মধ্যেই অনেক খানি পাই। শরীরটা ঠিক রাখার জন্য, সামর্থ্য ও চেষ্টার অভাব ত আছেই! তার উপর বর্ত্তমানের সামাজিক, সাংসারিক, পরিবেশ এবং আজ ক'দিন ধরে যে বৃষ্টি বাদল আরম্ভ হোয়েছে মোটেই সুখকর নয়।

দেশে, পল্লীগ্রামই ছিল, সহর—মুঘল, পাঠান যুগে যা ছিল তাও খুব কমই —যাঁরা একান্ত দরবারী বা দরবার ঘেঁষা ছিলেন—কেল্লা ও দরবার ঘিরে কিছু বসতি—তাঁরাই গ্রামে সামান্য একটু ফার্সি শেখার ব্যবস্থা করতেন একজন ওস্তাদজীর আখড়া কোরে।

আমাদের গ্রামেও (দাদার বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে) ওস্তাদজীর বাড়ীর চিহ্ন একটু আছে। তখন ও যায়গাটা মূল গ্রামের সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। যখন কলিকাতা ধীরে ধীরে সহর হতে আরম্ভ করেছে—,গ্রাম থেকে একটী একটী কোরে—(এখন রাত্রি আটটা আপনাকে চিঠি লিখছি, ধর্ম্মদাসের মেয়ে তুটী,

সুব্রত, এবং ছোট ছেলেটাও একটা ময়দা দিয়ে পুতুল গড়ে নিয়ে এল, আমাকে দেবার জন্য, মাঝে এই রকম নিয়ে আসে)—আশ্চর্য্য আমার বয়স যখন এই-রকম ছিল, আমার দিদিমা ঠিক এই রকমই পুতুল গড়তেন, একটুও তফাৎ নাই। পূজার আগে শেয়াল শকুনি ভাসান পর্ব্ব হ'ত। সকাল বেলায় ছেলে বুড়ো, মাটীর পুতুল, শেয়াল শকুনি, শালপাতার চোঙ্গার উপর রেখে মাথায় কোরে পুকুরে নিয়ে যেতে হ'ত, জলে ডুবিয়ে নিজে ডুব দিয়ে, উঠে এসে সামনে পাড়ের উপর বট গাছের তলায় ষষ্ঠীর পূজা হ'ত, বৃদ্ধ গৃহিণীরা ছেলেদের হাতে ষষ্ঠীর প্রসাদ কলাই ভিজান খেতে দিত, সে এক মহা আনন্দের পার্ব্বণ। এই পর্ব্বদিনের আগের রাত্রে দিদিমা সকলকে নিয়ে ঐ পুতুল গড়তেন। চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হ'ল, (কোনদিনই এই পার্ব্বণ সম্বন্ধে ভাববার অবকাশই হয় নাই।) আমাদের দেশে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসকে যম মাস বলে। বর্ষার জলে ভিজে শিশু ও বৃদ্ধের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। বোধহয় মড়কের আকারে দেখা দিত, মড়ক হলে শেয়াল শকুনির মেলা, তাই দেশ থেকে বোধহয় শেয়াল শকুনির বিসর্জ্জন এই ভাবে দেওয়া হত। তারপরেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—ভাই ফোঁটার উৎসব, যমের কাছ থেকে ভাই···রক্ষা করবার জন্য বোনের আকুতি। ছবি আঁকা, গান গাইতে, কবিতা লিখতে কাব্য লিখতে যেমন একটা ঘটনা দরকার, পাত্র আধার না হ'লে সবই ত হাওয়া=শূন্য—পাত্র, ঘটনা, তাকেই আশ্রয় কোরে বিভিন্ন কলার প্রকাশের ভঙ্গী পৃথক পৃথক। প্রথম স্বভাব থেকে যা সৃষ্টি হয় তাতে এই পরিমাপক জ্ঞান, বিশুদ্ধ হ'ত ইহাই স্বাভাবিক, মানুষের বয়সের সঙ্গে যত চালাকী বাড়তে থাকে, তাকে এমন

[অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি=

প্রিয়বরেষু দৈনন্দিন জীবনে নানা সুবিধা অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিজ পেশার কর্ম্মের মধ্য দিয়ে জানা, (যদি কারুর মনে জানার ইচ্ছা হয়) দেহ-ধর্ম্মে ও মনধর্ম্মে,—অসুবিধা, বিঘ্ন, অসুস্থতা যাবতীয় কিছু যা মানুষের কষ্টের কারণ, সেই থেকে জ্ঞান পাওয়া যায়=সুখের মূলে দুঃখ, দুঃখের মূলেই সুখ।

এইটুকু, আমি বই পড়ে অনুভব করি নাই, নিজ জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ইহা অনুভব করি, কিন্তু ইহা নয় যে বিঘ্ন অসুবিধা দুঃখ কষ্ট ইহা আমার দেহ-মনে যন্ত্রণা দেয় না, নিশ্চয়ই দেয়, আমি পাথর বা মৃত নই, এই দুঃখকষ্ট-কে এড়িয়ে যাওয়া ইহাতে ঠিক রাস্তা নয় এর কাছে কৃতজ্ঞ, যদিও দুঃখে, কষ্টে, দৈহিক যন্ত্রণায় মা-গো বাবা-গো ব'লে, আপন মনে, কিম্বা আপন জন সামনে এলে বেশী ক'রে চিৎকারে ঐ শব্দগুলি আওড়াই। মানুষ জীবের স্বভাব ধর্ম্মের, একটা অংশ চিত্র কর্ম্ম=আমার জীবনে এই চিত্র কর্ম্মকেই পেশা করতে হয়েছে, এই পেশার মধ্য দিয়েই জানার চেষ্টা করতে হয়েছে, তার পর এল, নিজেকে জানার ইচ্ছা কর্ম্মের মধ্য দিয়েই। শোনা কথাও শুনেছি কিছু পড়েওছি, সে সব ত শুধু শোনা কথাই শোনা কথা বলতে যেয়েই এই টুকুই অনুভব করছি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত ত বটেই এই মানব দেহভাণ্ডও অনন্ত এর শেষ নাই ঘুরছেই···। কত ঋষি তপস্বী, ঋষি তপস্বীরাই যাঁদের শ্রেষ্ঠ ব'লে অবতার বলে স্বীকার করেছেন তাঁদের কর্ম্ম তপস্যার পর যে সব বাণী দিয়ে গেছেন, তারপর কি আর এ অবস্থা, (আজকার) পৃথিবীতে আসা সম্ভব হয়, কেন সম্ভব হয় তাও লিখতে গেলে ও বলতে গেলে, আর এক মহাভারতের অবতারণা করা চলে, লেখা বা বলার বিভাগের যাঁর ইচ্ছা হবে তিনি আবার দ্বিতীয় মহাভারত, কিম্বা বেদবেদান্ত লিখবেন।

আমার চিত্র ধর্ম্মে ভিন্ন পন্থা জানার বা জানাবার

শ্রীশ্রীহরি

আদি	মধ্য	অন্ত	এই মাত্র রাস্তা
সত্ত্ব	রজ	তম	এই মানব-দেহের
আদিম	যুবক	বৃদ্ধ	ভিতরে বায়ু
শিশু	প্রৌঢ়	অতিবৃদ্ধ	কফ, তিন নাড়ী=

নিজেকে জানার জন্য কর্ম্ম করা ত্রিগুণাতীত মন নিয়ে

মানুষ জীবের রচিত চিত্র কর্ম্মের মধ্য দিয়েও এক যুগের চিন্তা কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়

শ্রীশ্রীহরি

মাটী	যাই গড়তে যাও	নূতন গড়ন দিতে হলে, তাকে
পট	মেখে, কেটে, পুড়িয়ে	ভেঙে পুড়িয়ে তবে গড়া হয়
লোহা	হাতুড়ি পেটা কোরে	
সোনা	তবে গড়া যায়	

পোর্ট্রেট ছেড়ে **এই রাস্তায়** আসবার আগে প্রথম পদক্ষেপ কেবলি মনে হয়েছে কলিকাতায় আর্ট স্কুলে এসে যে, যে, দেশের চিত্র চোখে পড়েছিল.. বাইরের গড়ন ইওরোপ, চীন তিব্বত **না দেখার মত** ওরিয়েণ্টাল আর্ট (শ্রদ্ধাস্পদ অবনীন্দ্রনাথ ও মিঃ হ্যাভেল প্রবর্ত্তিত) এদের মত কিছুতেইনা— দেশের শিল্প কি—কিছু জানা দেখা সেই চক্ষে ছিলনা। এবং সেইটাই স্বাভাবিক

শ্রীশ্রীহরি

১।২।৫৩

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু

আপনি যেদিন এসেছিলেন, তখন শরীর বেশ সুস্থ ছিলনা, তারপর কয়েক দিন বেশ অসুস্থ ছিলাম, এখন একটু ভাল, তবে পটল, মণ্টুকে দিল্লী যেতে হোয়েছে একলা আছি, আস্তে আস্তে কাজও কর্চ্ছি। আপনার খবর এই কদিন পাই নাই, আশা করি সকলে ভাল আছেন। জগত ও এই বাংলা দেশ তার ভিতরে, আমার বাড়ীর ও নিজেরও স্বাভাবিক কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাভাবিক পরিণতি স্পষ্ট ও দ্রুত, সংসার ধর্ম্মে ও দেহধর্ম্মে কষ্টদায়ক হ'লেও চিন্তা ও কাজের পক্ষে ইহাই সুসময়। অহরহ অশেষ যন্ত্রণা অনুভব করি, ইহাকে অতিক্রম করার জন্য চিন্তা ও কাজের বিরাম নাই=, এর মাঝে, কেবল আপনাদের সঙ্গে পেলে একটু ভুলে থাকি মাত্র। আমার শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

৭।৩।৫৩

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন বালিগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

তারা স্বস্থ হোয়ে উঠলে, পটলের বিবাহে আপনার অনুপস্থিতিতে একটু দুঃখ নাই, তারার জন্য আপনার ও বৌমার মনের অবস্থা অনুভব করি, তারা একটু স্বস্থ হোয়ে উঠুক এই কামনা করি, বলিষ্ঠ মনের জন্য শরীরের ক্ষীণতার কষ্ট একটু আছেই। আমার শরীরটা একেবারেই স্বস্থ নয়, উদ্বেগেও সর্বদা ক্লান্ত। পটলের বিবাহে কোন দিকেই কৃপণতা করার উপায় নাই যথাসাধ্য করা উচিত। আমার সমস্ত কিছুর মূলে প্রথম আপনারা তারপর পটল। এই মাত্র পটল ইরা কাছে দেখা করতে যাতে ঐ দিন ইরা আসে। তারা উপস্থিত কেমন আছে জানাবেন। আমার শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৮।৩।৫৩

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন বালিগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

আপনাদের কাছ থেকে যা পাই মনে হয় প্রচুর,=আমার দিক থেকে, মোটেই তৃপ্তি পাই না অস্থিরতা বাড়ে। পটলের বিবাহ কোন রকমে হোয়ে গেল, অনেকটা স্বস্তি বোধ করছি। নিজের কাজে মন দেবার জন্য দারুণ অস্থিরতা বোধ কর্চ্চি। আপনারও অবস্থা অনুভব করছি, তারার শরীর কেমন আছে জানাবেন। ইরা আসতে পারে নাই=যেদিন পটলদের পাঠিয়েছিলাম, ইরার সঙ্গে দেখা হয় নাই। এই দুদিন সকালে উঠেই মনে করি আজ নিশ্চয়ই আপনার কাছে যাব, কিছুতেই আর হোয়ে উঠেনা, ততই অস্থিরতা বাড়ে। সকালে নবযুগের কাছে পটলকে পাঠিয়েছিলাম, অসুস্থ ছিল খবর নেবার জন্য। বিকালে হয়ত পটলদের পাঠাতে পারি, আপনার কাছে। আপনি শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইরা ও পপাকে আশীর্ব্বাদ দিবেন। ইতি

আপনার যামিনীদা

শ্রীশ্রীহরি

মহাসপ্তমী

১৫।১০।৫৩

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালিগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

এখনও চিঠি ঠিক গুছিয়ে লিখতে পাচ্চি না। তিনদিন হ'ল আপনার জন্য খুব অস্থির হোয়ে ছিলাম। ছবি দুটী ও বইটী, প্যাক কোরে রিখিয়াতেই পাঠাবার জন্য। পটল, খুব সুন্দর ও মজবুত কোরে প্যাকিং কোরে ছিল। গত কাল ও পরশু, পটল ও মণ্টু দু'দিনই ফিরে এল পোস্ট অফিস থেকে এত ভিড়। বাক্সটীও একটু বড় হোয়েছিল। আপনি যেদিন এসেছিলেন, সেই রাত্রি থেকেই খুব অসুস্থ হোয়ে পড়েছিলাম, একা পটলের উপর সমস্ত কাজেরই ভার। সেই জন্য পরদিন ছবি দুটী নিয়ে যেতে পারেনি। বইগুলিও তার পরের দিন এসে পৌছল। রামবাবুও খুব অসুস্থ তাই তিনি বহু দূরের স্বাস্থ্য নিবাসে আছেন, তাঁর কর্মচারীর অবিবেচনার জন্য বই পেতে আমার দেরী হল। গত কাল পর্যন্ত ছবি দুটী ও বইটী গেল না। এইসব জন্য আরও অস্থিরতা বেড়েই ছিল, সমস্ত দিন। সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেয়ে অনেকটা সুস্থ হ'লাম ত। কিন্তু গুছিয়ে চিঠি লেখা হচ্ছে না, এত অস্থিরতা। পরে একটু সুস্থ ও শান্ত হলে অনেক কথা লিখব, আপনার চিঠি মর্ম স্পর্শ করে, যত ছোট চিঠিই হোক। আর, এ চিঠির ত কথাই নাই। জানেন, প্রায়ই যখন মনের মধ্যে খুব রাগ হয়, নিজের উপরেই বেশী, সংসারের উপর, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর, তখন, মনে হয় একজন ইংরাজকে ডেকে ইংলণ্ডের জন্য একজন আমেরিকানকে ডেকে আমেরিকার জন্য, একজন রাশিয়ানকে ডেকে রাশিয়ার জন্য, আর বিষ্ণুবাবুকে ডেকে শুধু বিষ্ণুবাবুর জন্য সব ছবি ছেঁড়া কাগজ কাঠ, ফ্রেম দিয়ে দি। ঐসব যায়গায় ছবিগুলি সমাদরে থাকবে, কিম্বা প্রতিদান দেবার জন্য নয়, আপনি ভালবাসেন, কি উপকারী বন্ধু দুখানি ছবি দিয়ে, আপনার মন রক্ষা করব—এ ভাব নিয়ে চলা আর আপনাদের অপমান করা সমানই। সমস্ত রাশিয়াকে দেখেছি দুটী মানুষের ভিতরে (স্বর্গীয় পুডভকিন, ও মিঃ চেরকাসভ) তাঁদের ভঙ্গী ও ধ্বনি, বহু ইংরাজ বহু আমেরিকান, তাঁদের ভঙ্গী ও ধ্বনি, দেখে ও শুনে মনে হয় এদের চোখ, মৃতের নয়। তাইও ওঁদের

কাছে ইচ্ছা করে দিতে। আপনার ও বৌমার, এমনকি ইরাতারাপপা, এদেরও, আপনাদের ছবি দেখা, ভঙ্গী, ধ্বনিতে আমার মনে হয়, ছবি, এরা ও আপনারা দেখেন, তাই আমার ছবি দিতে ইচ্ছা হয়।

ভালো কোরে ভদ্র কোরে—চিঠিটা পরিষ্কার কোরে লেখার চেষ্টা করলে এ চিঠিটা আজও না, কালও যাবে না, তাই কোন রকমে আমার মনের কথা, যতটুকু পারলাম লিখলাম। আমি উঠে বসে, কাজ করার কথা ভাবছি ও টুকুটাকু কাজও করছি ভুলে থাকার জন্য।

আজ একটু শান্তিতে থাকতে পার্চ্চেন, ইহাই পরম লাভ। ইরা, তারা, পপা ও কল্যাণীয়া বৌমা একটু সুস্থ থাকলেই আপনার শরীর মন ভাল থাকবে। কল্যাণীয়া বৌমা ও ইরা তারা পপাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আপনি আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যামিনীদাদা

রিখিয়াতে ছবি আর বইটা পাঠাবার ব্যবস্থা স্থগিত রাখিলাম।

চিঠিটা সম্পূর্ণ হ'লোনা কোন রকমে আজ ডাকে দিতে পারলাম, এতেই সুস্থ বোধ কর্চ্চি।

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৮।১০।৫৩

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

৺বিজয়ার শুভকামনা গ্রহণ করবেন কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। ইরা, তারা, পপাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। ক'দিন আগে একখানি চিঠি দিয়েছি বড়ই অস্থির হোয়ে ছিলাম, ঠিকমত প্রকাশ করা সম্ভব নয় ঐ অবস্থায়। নিজেকে সংযত করাও যেমন দরকার, ঐ অবস্থারও প্রকাশ হয়ত সময় বিশেষে দরকার। তাই ইচ্ছা, অনিচ্ছায় প্রকাশ হোয়েই পড়ে। সবার উপরে আমার কাজে, কথায়, আপনাকে একটু শুদ্ধ আনন্দ দেবারই

একান্ত ইচ্ছা। একটু সুস্থ বোধ কচ্ছি। পরে আবার চিঠি দোব। আপনার চিঠি পেলে সুখী হব। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

১৮।১।৫৪

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

কিছুদিন থেকে মনের অস্থিরতা খুব বেড়েছে, শরীর জীর্ণ, বায়ুধর্ম্মী মন, এই বাস্তবকে কিছুতেই মানতে চায় না। রোজই মনে করি; একবার আপনার কাছে যাব, তার জন্যে চিঠি লেখাও হয় না, মনের এই অবস্থায় চিঠিপত্র লিখতেই পারি না, ভিতরে এই জ্বালা বাইরে সুস্থ ও সজ্জন সেজে থাকতে হয়। আপনারও ভিতরের জ্বালা ও বাইরের স্নিগ্ধ মানুষটিকে দেখে আশ্বস্ত হই। আপনার শরীর অসুস্থ তবুও একদিন যেতে পারি নাই, মনে কষ্ট পাই। আপনি আসার চেষ্টা করবেন না, আমি শীঘ্রই একদিন যাব। আমার শুভ কামনা গ্রহণ করবেন। কল্যাণীয়া বৌমা—ইরা, তারা, পপাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যামিনীদাদা

২৪।৪।৫৪

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু

একবার দেখা করার ও কথা কওয়ার জন্য মন খুব অস্থির হোয়েছিল। স্কুলের ছাত্রীদের অভিনয় দেখে আসার পর থেকে আরও তীব্র। একটা উপলক্ষকে আশ্রয় কোরে মনের এই জ্বালা, দেহজীর্ণ, বায়ু এই তাণ্ডব সহ্য করা দায়। গতবারে ও এই বারেরও অভিনয় দেখে, কেবলি মনে হয়—এই কটা বালিকাকে নিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়। কিন্তু এই কটা বালিকার শক্তি ও দক্ষতা কেবলি ব্যর্থ হোয়ে যায়—অতি—অতি দুর্বল রচনা, যাহা নৃত্য, সঙ্গীত,

এবং দৃশ্য নাট্য কোন কিছুরই দ্বারা সুঅভিনীত হ'তে পারে না। এর জন্যই সঙ্গীত, নৃত্য, দৃশ্য, কোন রসকে প্রকাশ করতে পারে নাই যে অঙ্কটা ভুল সেই অঙ্কটা নিয়ে রাত্রি দিন পরিশ্রম করলেও অঙ্ক ঠিক হয় না। প্রশ্নটাই যে ভুল। নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয়—অথচ নৃত্যের প্রধান আশ্রয় ঘুঙুর ও পা। রং নাই তুলি নাই ছবি আঁকতে বসা। ঘুঙুরের ধ্বনিতে কাম উদ্রেক করে—তাই এ দেশে (বাংলায়—) নূপুরের আবিষ্কার—তবলার পরিবর্ত্তে খোল। এত বড় আবিষ্কার—মনে হলে মাথা আর মর্ত্তে থাকে না। এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলার রইল। একবার আপনার কাছে যাব এই ইচ্ছাই প্রবল ছিল না যেতে পেরে ছোট পোষ্টকার্ডটীর আশ্রয় নিতে হোল। শুভকামনা গ্রহণ করবেন। [অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

১।৫।৫৪

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু=

পোষ্টকার্ডটী অসমাপ্ত লেখা, ইচ্ছা ছিল, আর এক খানা পোষ্টকার্ডে বাকী টুকু লিখব* তাহা এই—এত ক্রটী সত্ত্বেও মেয়েগুলির আন্তরিকতা, নৃত্য-অভিনয়ে শক্তির পরিচয়, এবং যে কোন ধরণের অভিনয় শক্তির পরিচয়, এবং যে কোন ধরণের অভিনয় শক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়—আর অধিকারিণীর সুশৃঙ্খলতায় মোটামুটি অভিনয় সাধারণের উপভোগ্য—হোয়েছিল এবং আমার জানা অনেকের ভাল লেগেছিল। আমি অনেকটা লিখে তবে কতকটা প্রকাশ করি, অনেকটা লেখা আমার স্বভাব, আপনার অল্প একটু লেখা তাতেই দরদও থাকে বক্তব্যবিষয়ও প্রকাশ করা হয়, ইহাও প্রথম স্বভাব থেকেই আসে, তারপর বিচারে আইন তৈরি হয়—(ভাল লেখার) উচ্চাঙ্গের লেখার গড়ন মধ্যে ও নিম্নাঙ্গের লেখার গড়ন কি তার প্রয়োগ সীমা নির্দ্ধারণ, যুগে যুগে নৃত্যে অভিনয়ে, সঙ্গীতে, ছবিতে এবং ব্যবহারে—তার গড়ন কোন শ্রেণীর মানুষই তাহা স্থির করে, যিনি এই ধরণের কাজে মাথাটা দেন তাঁদের ও নিজ বিভাগের কাজটী

আর লেখা হ'ল না, নানা রকমে মনটা চঞ্চল, পটলকে এখুনি ডাক্তার বাবুর কাছে যেতে হচ্ছে।

গত কাল এসে ফিরে গেছেন—খুব কষ্ট পেয়েছি এর জন্য, কোন দিন এমন হয় না, তখুনিই আপনার কাছে যাব ইচ্ছা করছিল তাও হ'ল না, বড়ই অস্থির হোয়ে যাচ্ছি, অমাবস্যা পূর্ণিমায় শরীর বড়ই খারাপ হয়, আপনাকে আসতে বলা এই রৌদ্রে—ইহাও অপরাধ বইখানি পেয়েছি—সর্ব্বপ্রথম ছবি খানি—ও সবটা মিলিয়ে যত ছবি আছে, দেখে ভাল লেগেছে। ইরা তারা পপা সকলে কেমন আছে লিখবেন। আপনার ও কল্যাণীয়া বৌমার শরীর কেমন আছে? আমার শুভ কামনা জানাচ্চি। ইতি

আপনা*

যামিনীদাদা

*ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেদিন হাতের কাছে ডাকটিকিট কিম্বা পোষ্টকার্ড আর ছিল না,

শ্রীশ্রীহরি

১।৯।৫৪

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন,

কলিকাতা ১৯

প্রিয়বরেষু=

যেতে আর পারলাম না, আজকাল চিঠিও লিখতে পারি না, কিসের খোঁজে মনে একটা অস্থিরতা সর্ব্বদাই,—মাঝে মাঝে খোঁজও পাই বুঝতেও পারি। দেহ ধর্ম্ম—সীমা বদ্ধ,—বাধা হয় এই খানেই। আপনার শরীরের জন্য চিন্তা হয়, কারণ রক্ত চলাচলের মাপের অল্পতার—যে কষ্ট—তাহা আমি জানি—তবে একেও কাজে লাগালে মোটামুটি—,কাজ ভালই হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতার দেহের এই দ্বন্দ্ব শক্তিকে ঔষধ প্রয়োগে তীব্রতা আনা—অপেক্ষা—মেনে চলায় সুফল পাওয়া যায়,—এই ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির পথই ভাল মনে হয়। ইরা, তারা, পপা এদের খবর জানাবেন। কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। আপনি শুভকামনা গ্রহণ করবেন।

ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৯।৭।৫৫

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু

মাঝে মাঝে মনটা চঞ্চল হয়, তাই পটলকে পাঠালাম, কেমন আছেন, সকলে, জানবার জন্য। দেহ, মন, পরিবেশ, কর্ম্ম, এর তাণ্ডব থেকে, ব্যবহারিক দিকটা অন্যের পক্ষে বেশ সুখকর নয়, ইহা অনুভব করি কিন্তু কোন রকমেই সংযত হ'তে পারি না, এর জন্য পরে দুঃখ পাই। আশাকরি আপনার শরীর একটু ভাল আছে। ইরা তারা পপাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আপনি শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশ্রীহরি

৭।৮।৫৫

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু—

কিছুতেই শান্ত হ'তে পার্চ্চি না, কোন জাতের, কোন সমাজের, কোন ধর্ম্মীর, কোন অঙ্গের অলঙ্কার তৈরী করবে শিল্পী? মাঝে মাঝে বাড়ীর বাইরে বেরুলে ধাঁধা লেগে যায়, সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। আপনিও যে কষ্ট পান তা অনুভব করি—তাই উভয়ে উভয়ের সঙ্গ পেলে কতকটা শান্ত হই। আপনাকে বার বার আসতে বলতে মমতা জাগে মনে,—গতকাল ওখান থেকে ফিরে রাত্রে খুব যন্ত্রণা পেয়েছি, তাই আজ ইচ্ছা করছে একবার আপনার সঙ্গ পেতে। পটলকে পাঠালাম, মিঃ টিপটনের কাছে যদি সন্ধ্যার পর তাঁর কোন অসুবিধা না থাকে আপনি শুদ্ধ, ওঁর ওখানে একটু বসতে, তবু একটা বিশেষ জাতের বিশেষ ধর্ম্মীয় কাজ দেখে চোখটা ঠাণ্ডা হয়। একটা বিশিষ্ট গড়ন—ইহাই আমার কাম্য—ছোট হোক বৃহৎ হোক ভাল হোক মন্দ হোক কিছু এসে যায় না। অনেকটা লিখে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি,

অভ্যাস, ইহাকে সংযত করতেই পার্চ্চি না। যদি মিঃ টিপটনের ওখানে আজ সুবিধা না হয় হয়ত সন্ধ্যার পর আপনার কাছেই যেতে পারি আপনি বাড়ীতেই থাকবেন ত। আমার মঙ্গল কামনা জানাচ্চি। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনার

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৬।৮।৫৫

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

কলিকাতা-১৯

প্রিয়বরেষু

ভাবাবেগে মুগ্ধ হোয়ে, লিখছি, তা ত নয়ই—শুধু আপনাকে জানান দরকার মনে করি—তাই—আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, আমি শুধু—ভাবছি, প্রতিদিন প্রতি ঘটনার প্রতি গড়নে, যে দাম দিয়ে—এই অভিজ্ঞতা কেনা হচ্ছে—, আজকার—এই অভিনয়টীও তার মধ্যে একটী—, আগের অভিনয়েরও প্রতি অংশের সমান দক্ষতা—ছিল—, তখনও এমনি ক্ষুব্ধ হোয়েছিলাম তবে এবারেরটা বেশ তীব্র চণ্ডালিকা ও মায়ের অংশে যে মেয়ে দুটীর—যেমন দক্ষতা, তেমনি অত বড় ষ্টেজকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা,—যাঁরা পেশা নিয়ে প্রতিদিন অভিনয় করেছেন, তাঁদেরও বেশ বেগ পেতে হ'ত বাঙ্গালী পল্লীর মধ্যে—অনেকটা ঘরোয়া পরিবেশের ষ্টেজের উপর আধিপত্য করতে। আর এই মেয়ে কটী কতই বা বয়স, বছরে এক দুবার অভিনয় কত বড় দুঃসাধ্য কাজ,—মমতায় অন্তরটা ভরে যায়—এই যে এক একটী মানুষ—জীব এর সম্ভাবনাকে অপচয় করার অপরাধ, দেখে ক্ষুব্ধ না হোয়ে পারি না। যে সভ্যতায় যে সমাজ ব্যবস্থায় আর কতদিন এবং কত খানি দাম দিতে হবে। পেশাদার থিয়েটারের এবং নৃত্যশালায়, এমন কি গ্রাম্য যাত্রার দলেও—সব জায়গাতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার আছে। দেখেছি, তাঁদের উহাই একমাত্র কাজ ও চিন্তা দুই পক্ষেরই—সংঘটক শিক্ষক, পোষাক (সজ্জকের) অন্যান্য খুঁটিনাটী প্রতি বিভাগে বহুদিনের অভ্যাসের দক্ষতা—তবু কত এদিক ওদিক হোয়ে যেত প্রায়ই, আর—এই অভিনয়টীর সংঘটক, প্রযোজক, শিক্ষক, সবার

উপর প্রধান যিনি যাঁর উপর সর্বকিছু দায়িত্ব, ও সর্বকিছুই নির্ভর করছে তাদের সকলেরই ভিন্ন কাজ ভিন্ন চিন্তা। তাঁদের এই সুশৃঙ্খলতার চিহ্ন অভিনয়ে সবটুকু জুড়ে, এবং সকল অংশেই, যারা ক্ষুদ্র অংশে অভিনয় করেছে তাদের দক্ষতাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আজকার অভিনয়ে প্রত্যেকটী মেয়ে এবং শিক্ষক, সজ্জাকর প্রযোজক সমান আদর পাবার অধিকারী,—

নৃত্যের মধ্যে যে নাটক ছায়া নৃত্য ছৌ নৃত্য নাগপুর ছোটনাগপুর উড়িষ্যায় পাহাড়ে জঙ্গলে সেই ফরমেই দক্ষিণে কথাকলি পুতুল নাচ—এইগুলি সবই নিম্নস্তরের—বহুদিন নানা অজ্ঞানতার মধ্যে বহুদিন অমার্জিত অন্ধ অভ্যাসে নানা কুসংস্কার নানা আপদ আঘাত করেছে সব শিল্পের উপরই আমাদের দেশে ইহা এক মর্মন্তুদ ট্রাজেডি। ঐ ষ্টেজের উপর অভিনয় করেছে তাদের একজনের সামান্য ত্রুটিতেই সমস্তটাই পণ্ড হোয়ে যেতে পারে এমনি একটী ব্যাপারে প্রতি লোকের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। বিশেষ কোরে অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশের অভিনয়ও যে কত দায়িত্বপূর্ণ, যাঁর এই শিল্প সম্বন্ধে কিছুটা জানা আছে তিনিই জানেন বড় অংশে অভিনয়ে অনেকটা, সাহায্য পাওয়া যায় মূলে, তার সেই অংশটাই নাট্যকারের দেওয়া সাহায্য। একটু ভুলত্রুটীও মানিয়ে যায় দর্শকের কাছে সহানুভূতি পায় কিন্তু ক্ষুদ্র অংশের অভিনয় বড় শক্ত—ইচ্ছা করলে [অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

২৯।১০।৫৫

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু

৺বিজয়ার শুভকামনা জানাচ্ছি। আপনার চিঠি পেয়ে, ক্লান্ত শরীর মনে অনেকটা স্বস্তি পেলাম। দুদিন ধরে নানা সমস্যার কথা লিখে যখন আজও শেষ করতে পারলাম না তাই এই পোষ্টকার্ডটিতেই শুধু শুভকামনাটুকু জানিয়ে একটু লিখলাম। পটল আজ এসে পড়েছে—ডাক সাজ, ঘোড়া হাতী বেড়) অনেক কিছু এনেছে। ইরা, তারা, পপার জন্য মন কেমন কর্চ্চে, বেলতোড়ে মেচা পটলের আনা মিষ্টি—এখানেও নানা উপলক্ষে আসা মিষ্টির প্রাচুর্যে শরীর মন ক্লান্ত। সহজ দৈনন্দিন জীবন কাম্য মনে হয় এ পরিবেশে। সকল

দিকে ঐ এক কথা শিল্পে সাহিত্যে রাষ্ট্রে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মে, ধর্ম্মজীবনেও। থামতে চায় না, পোষ্টকার্ডে রেহাই নাই। আর কতদিন থাকা হবে জানাবেন। বৌমাকে ও ছেলেদের আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আপনি আমার শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনার
যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

৯।১১।৫৫

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন,
কলিকাতা ১৯

প্রিয়বরেষু= আপনার চিঠিটী পেয়েছি, ছোট্ট একটু লেখার মধ্যে, যা, অনুভব করি লিখে জানান সম্ভব নয়—মনে হয় যেন বিরাট আকাশের মত সীমাহীন। মাঝে মাঝে আপনার কাছে শোনা, টুকরা খবর যথা পিকাসোর কথা—আরও অনেকের কথা, এবারের ম্যানের অনুবাদও যখন মাঝে মাঝে মনটা খুব উদ্বিগ্ন হয়—, নানাকারণে—তার মধ্যে সবটাই প্রায়—চিত্রশিল্প জগতের—সমস্যা নিয়েই, সেই সময় ঐ সব টুকরা খবর গুলি মনে অনেকটা জোর দেয়। মাতিসের শেষজীবনের—কাগজ কেটে বসানর ছবিটিও লাইফ পত্রিকায় দেখলাম, ক'মাস আগের। পিকাসোর পটারির উপর কাজ করার সংবাদও আপনার কাছে এবং আরও দু' একজন বিদেশী বন্ধুর কাছে শুনেছি ঐ টুকু খবরই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ও দেশের চিত্র শিল্পের সমস্যাটী যত বৃহৎ ও জটিলই হোক—তার একটা জাত, চরিত্রি, আছে, তা সেটী যে স্তরেরই হোক, সে স্তর বিচার পৃথক প্রশ্ন, যদিও আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের সমস্যার সঙ্গে তার বিচার অবশ্যি দরকার, কিন্তু সে বিচার, পৃথক। আমাদের দেশে এই বিভাগের সমস্যা, আপনার বিভাগে সাহিত্যের সমস্যা ও সমপর্য্যায়ের যে সমস্যার জাত চরিত্রি নাই, ভুল প্রশ্নের জবাব শুদ্ধ ত হয়ই না, পরীক্ষক ভুল প্রশ্ন কোরে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা করেন। আমাদের দেশে শিল্প ও সাহিত্যের পরীক্ষাও নাই পরীক্ষার্থীও ছিল না, ইংরাজ আসার পুর্ব্বে —সহজাত সংস্কারে—চলতি পথে—চলেছিল কারিগর ও গ্রাম্যকবি, আর—

যত কিছু সমস্যা ছিল ধর্ম্ম নিয়েই—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আরও কত কি ? বৃহৎ মস্তিষ্ক সংস্কৃত—ভাষায়—তত্ত্ব বিচার নিয়েই কাটিয়েছেন কতকাল—এও বোধ হয়—মহাপরীক্ষকের ভুল প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষার খেলা।—এতো গেল যা গত—বর্ত্তমানেই,—অতীত ও ভবিষ্যতের সব কিছু সমস্যার প্রশ্ন ও উত্তর সব পাওয়া যায়—ইহাই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ-পথ, যদি মহাপরীক্ষক তাঁর খেলা পরিবর্ত্তন কোরে—সত্যিকারের নির্ভুল প্রশ্ন করেন, অবশ্য তাঁর ইচ্ছাতেই, পরীক্ষার্থীও পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হবে। বর্ত্তমান—আমরা দুজনই এত দেশ থাকতে এই পশ্চিম বঙ্গেই জন্মেছি যাতে আমাদের কোন হাত ছিল না, যার ভাষা বাঙ্গলা—এটাও পাওয়া, এবং এতদিন ধরে তাই কালচার, কৃষ্টি—নামে সারা পৃথিবীতে প্লাবন এনেছে,—ঐ জাতিদের মধ্যেই ইহার আবিষ্কার। প্রচার করাও খুব স্বাভাবিক, এঁদের পিছনে, যন্ত্রবল, অস্ত্রবল, অর্থবল সব কিছুই আছে,—তাঁদের পক্ষে হয়ত ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁদের অর্থাৎ আমাদের পিছনে—অতীতে ও বর্ত্তমানে উপরে উক্ত কোন কিছুই নাই, তাদের এই নকল কালচারের ও কৃষ্টির সাহিত্যে শিল্পে, নাচে, সব কিছুতেই আজ এই দেশেও প্লাবন এসেছে—ইহার সামনেই দেখা যায়, যাঁরা এর মূল—তাঁদের মৃত্যু—এই অগণিত নকলওয়ালাদের ভারে। [অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

১৬।৩।৫৬

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু=

যে স্কেচটী মিসেস্ শীলের [শীল্স্] পছন্দ হোয়েছিল সেটীও গতকাল পটলের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, দুজনেই খুব খুসী হোয়েছেন। আপনার দেওয়া ছবিখানি যতদূর সম্ভব পুরাতন ভাবটা বজায় রেখে,—রং ও যেখানে যা করার দরকার ছিল, তা কোরে খুবই ভাল দেখাচ্ছিল, তাঁদের ভাল লাগলেই একটু আনন্দ পাওয়া যাবে। আপনার শরীরের জন্য মনটী চঞ্চল হয়,—একটী মাত্র যায়গা, যেখানে মনটাকে একটু সায় দিতে পারি। তবে আমাদের যে মানসিক যন্ত্রণা, তার থেকে শরীরের যে অসুস্থতা, তাহা

আমাদের কাজের অনুকূল ইহাই মনে হয়, তাই এই অবস্থাকে মেনে নিয়েই কাজ করতে পারি।

মহাভারত যুগে,—পুরুষও নয় নারীও নয়, এমন জীবের সঙ্গে সংগ্রাম ত দূরের কথা দরশন মাত্রই অস্ত্র ত্যাগ। আজকের যুগ —উপরোক্ত জীব, বা অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের—অভিজ্ঞতারও দরকার ছিল, বা, আছে—তাই এই অবস্থা এসেছে,—এ এক অদ্ভুত অবস্থা, যে জমীর উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে হ'বে, তার উপর শক্ত ও সোজা হোয়ে দাঁড়ানই একটী সংগ্রাম, তারপর ত কাজ! আবার অনেকটা লিখে ফেললাম, কিছুতেই সংযত হোতে পারি না।

শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১২।৭।৫৬

প্রিয়বরেষু=

সেদিনের আলাপটী মাঠে মারা গেল, যদিও ওঁরা আসতে ভিন্ন ধরণের আনন্দ অনুভব করছিলাম। আজ পৃথিবীর অন্য অংশের (বৃহত্তম অংশ) সমস্যার সমাধানের জন্য যাঁরা চিন্তা করছেন, সঙ্গে কর্ম্মও, তাতে জটিলতা বৃদ্ধিই হচ্ছে--, যেমন বহু পূর্ব্বে,—এই এশিয়া ভূখণ্ড—বিশেষত ভারতে, যা দেখা যায় না—সেই ধর্ম্মতত্ত্বের দেবতা, উপদেবতা এর সমস্যা নিয়ে নানা অংশ নানা সমস্যার উদ্ভব, ও সমাধান জন্য বহু মস্তিষ্ক পাগলের মত—নানা, শ্লোক পুঁথিই রচনা ও কর্ম্মানুষ্ঠান কোরে জটিলতা বৃদ্ধিই করেছিলেন দুই পক্ষেরই কাজ, ও চিন্তা নিশ্চয়ই দরকার ছিল, তাই এসেছিল, ও এসেছে। আজ সামান্য একটী ঘটনা—মহামন্ত্রী-মন্ত্রী—উপমন্ত্রী এদের ঠেলায় অস্থির, তেমনি মহাদেবতা দেবতা উপদেবতা এঁদেরও ঠেলা তেমনিই, তবু এই সবের আচার অনুষ্ঠান, যা মানুষের রচিত, এও দেখা—কম কথা নয়। ক্লান্ত দেহমনে, একটু লিখব মনে ক'রে বসে—অনেক খানা লিখে ফেললাম।

আপনার শরীর, মন, কেমন জানাবেন। কল্যাণীয়া বৌমা ও ইরা তারা পপাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। আপনি শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

৬।১১।৫৬

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

প্রিয়বরেষু

এবারেও বাধ্য হোয়েও পোষ্ট কার্ডেই লিখতে হোল, আমার অভ্যাস ও চরিত্র,—অনেকখানি না লিখে তৃপ্তি পাইনা। শরীর মনের বর্ত্তমান পরিবেশে, তা আর পারিনা, শেষ পর্য্যন্ত চিঠি ডাকেই দেওয়া হয় না। আপনার চিঠিতে দু একটী, শব্দই—যথেষ্ট—। প্রায় বিন্দুতে, সিন্ধু। আগের চিঠিতে—**কাজ করবেন—এই চাই**—এইটুকুই আমাকে যে আনন্দ ও বল দেয়, তা লিখে জানান সম্ভব নয়। আপনাদের এই শুদ্ধ সম্পর্কের গুরু দায়িত্ব—ইহাই রক্ষা করা—এই টুকুই—আমার জীবনের সঙ্কল্প—ও কাজ—আশাকরি কল্যাণীয়া বৌমার, আপনার, ইরা, তারা, পপার শরীর ভাল আছে। সকলে আনন্দে কটী দিন কাটান, এই পরিবেশে হইাই যথা লাভ। বৌমাকে ও ইরা, তারা পপাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। আপনি শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১।১২।৫৬

প্রিয়=

অস্থিরতা, ব্যথা,—ব্যথায় যন্ত্রণা—দেহ মনে অনুভব করা—জীবন্তের লক্ষণ। দুই পক্ষ—প্রকৃতিতে,—প্রতি জড় বস্তুতে, জীবে, অণু পরমাণুতে অণুতে প্রচণ্ড শক্তিতে—ঐ দু পক্ষ আছে—বলেই দৈত্য শক্তি সম্পন্ন মানু

জীব বর্ত্তমানে দুই পক্ষের শক্তির দৃষ্টান্ত—স্বরূপ পরমাণু বোমা আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ জীবের উর্দ্ধতন পর্য্যায়ের মানুষ জীব, তাঁদের দেবতার স্বরূপে পূজা করি। দুই পক্ষের সংগ্রাম—পৃথিবী চন্দ্র, সূর্য্য, ব্যোম, যত দিন থাকবে, সংগ্রাম চলবে—ঠিক মত। ইহাই খেলা বা লীলা।

(২)

ব্যথা অস্থিরতা আছে বলেই পৃথিবীতে—আজ মানুষ জীবের যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের—যে প্রচণ্ড কূটনৈতিক সংগ্রাম চলছে—তাহা খুব স্বাভাবিক, আগে ধর্ম্মের মাধ্যমে এই কচাকচির ফলে নানা ধর্ম্মের উপর রাজশক্তি ও তার মাধ্যমই আপন অভীষ্ট পূরণ করেছিল। আজও এই কূটনৈতিক কচকচির তাড়নায় নানা মারণ-অস্ত্র—নানা যন্ত্র—আরও কত কি যে আবিষ্কার হলো—তাহাও দেখা যাচ্চে, ইহার মধ্য দিয়ে রাজশক্তি বনাম—রাষ্ট্র সংঘ—গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র—ইত্যাদি

পূর্ব্বে যাত্রার দলেও মন্ত্রীর সাজ পোষাক কথা—চালচলন ভাঁড়ের মত—আজও রাজার স্থলাভিষিক্ত মন্ত্রী—কিন্তু ভিন্ন আকারের ভাঁড়ই বলা চলে!

আগের ধর্ম্মগুরু ও তার দলবল নিয়ে ভিন্ন দেশে প্রচার মত বিনিময়, মীমাংসা ও নিজমত স্থাপনের জন্য দিগ্বিজয়ে বার হত—আর আজ—তার স্থানে চালাকির মাধ্যমে ভাঁড় মন্ত্রী—দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে ডুবে মরছেন।

[অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

৪।১০।৫৭

প্রিয়বরেষু

কল্যাণীয়া বৌমা, ইরা, তারা, পপাকে আমার শুভবিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আপনি আমার আন্তরিক শুভ কামনা গ্রহণ করবেন। আপনার পোষ্টকার্ডখানি আগেই পেয়েছিলাম,—ছোট্ট চিঠি খানি—, আমি অনুভব করি—সিন্ধু—, পূর্ব্বেও আর একবার লিখেছিলাম। আপনার চিঠি পাবার পর হঠাৎ শ্রীযুক্ত সত্যেন ভায়া, ইরাকে সঙ্গে নিয়ে এল,—ওদের পেয়ে আমার

খুব ভাল লাগল। সত্যেন ভায়াকে বললাম,—তুমি যে ইরা, তারা, পপাকে এমন কোরে আপনার জন কোরে নিয়েছ—এতে আমাদের পূর্ব্বসম্পর্ক তার উপরে এই সম্পর্ক। আমাকে তৃপ্তি দেয় খুবই—যখন বিষ্ণুবাবুর কাছে তোমার আদর যত্নের কথা শুনি—। পূজার কদিন—কিছুতেই একটু চিঠি লিখতে পারি নাই—মনটা নানা কারণে—চঞ্চল—ছিল শরীরটাও ভাল ছিল না। কাজ কচ্চি যতটা সম্ভব, তবু—ভিতরের একটা প্রবল তাড়না অনুভব করি সর্ব্বদা, রোগী সেজে কি বাবু সেজে ব'সে থাকতে লজ্জা বোধ করি।

জন টার্নারের ঠিকানাটী আবার লিখে পাঠাতে হবে—Mr. J. S. TURNER, LITTLE··· এর পরের লেখাটী বাদলার জল লেগে কিছুই বোঝা যায় না। বড় অক্ষরেই লিখে দিবেন। আমার লিখতে সুবিধা হয় বাক্সের উপরে।

ইরার কাছে শুনেছিলাম, ওখানে আপনার শরীর ভাল আছে, শুনে আশ্বস্ত হয়েছি, যথা লাভ। আজ আর বেশী লিখতে পারলাম না, অনেক চিঠি লিখতে হবে।

সঙ্গে একটী ছাপা কাগজ পাঠালাম টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ইয়ার বুকের জন্য। যদি দেওয়া দরকার মনে করেন, যা হোক একটু লিখে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। আমার পক্ষে অসাধ্য। জন্ম তারিখ ১১ই এপ্রিল—বৎসরটা মনে নাই তবে ৩০শে চৈত্র থেকে ৭০ চলছে।

আপনারা সকলে কেমন আছেন জানাবেন। সত্যেনভায়াকে আমার শুভকামনা জানাবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি=

২।৭।৫৮

প্রিয় বরেষু=

অনেক দিন আগে (৫০ বৎসর আন্দাজ) আমার দাদার কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম, আজ এতদিন পরে কাজে লাগছে, এক পণ্ডিত একদিন মুড়কি কোরে খাওয়াবার জন্য বললেন, মেয়ে মুড়কি কোরে বাপকে খেতে দিলে, বাবার খেয়ে খুব ভাল লাগল, মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন কি কোরে এমন

সুখাদ্য মুড়কি তৈয়ারী করলে মেয়ে পরিচয় দিলে—বাবা জিজ্ঞাসা করলেন : গুড় যখন ফুটেছিল, তখন গুড়ের পাক ঠিক হোয়েছে কিনা জানবার জন্য দুই আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করেছিলে ? মেয়ে বলল—না—আরে—ছ্যা—এ ঠিক হয়নি, তার বাবার মুখ বিস্বাদে ভরে গেল—ক'দিন যাবৎ রামায়ণ মহাভারতের উপর লেখা—চৈতন্যচরিতামৃত এমন কি ভাগবৎ এর উপর ব্যাখ্যা—শুনে বড় উদ্বিগ্ন অস্থির হ'য়ে পড়েছিলাম, এর কোন দরকারই না, জনসাধারণ জন্য—দু এক, জন, যাঁরা লিখবেন—থাকবেন—গড়বেন—তাঁরা আর যিনি মুড়কি তৈয়ারী করতে শিখবেন, তারা— [অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

২৮।৭।৫৮

প্রিয়বরেষু

এই নিষ্কর্মার দেশে, বিশেষ কোরে ছবি আঁকার কাজে—কাজ সৃষ্টি করা এখন,—তারপর কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি, আজ বিশেষ ক'রে মনে সর্ব্বদাই, এই বয়সে এখন কাজ করার প্রবল ইচ্ছা, শরীরে অবস্থা খুবই জীর্ণ তবুও, সর্ব্বদা মনে হয়, আমার

[অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

১০।৯।৫৮

প্রিয়বরেষু

পৃথিবীতে—জীবজন্তু গাছপাতা যা জন্মায় আপনি প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া—আবার প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় মানুষের ব্যাধির আক্রমণে পড়লে—তখন গাছ পাতা জীবজন্তু সব কিছুরই খোঁজ পড়ে।

যেমন আজ, বৃষ্টি—বন্যায়—মানুষের নানা অসুবিধায় মানুষ অস্থির আবার —প্রচণ্ড রৌদ্রে, ঝড়ে, বজ্রপাতে,—আবার শীতেও তেমনি—ইহা যেমন অপরের ব্যথা শুনে, দেখে কষ্ট হয়,
নিজের ব্যথায় স্পষ্ট হয় ব্যথার রূপ কি ? [অসমাপ্ত

১২।১০।৫৮

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠিটা পেয়ে মনটা অনেক শান্ত হ'লো। পটল বেলতোড়ে গেছে, মণ্টুও উত্তরপাড়ায় গেছে, একলা, এখানে কদিন মেঘের ঘনঘটা, আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি, তাতে বড়ই ক্লান্ত ক'রেছে তবু আজ সকালে— (এলিন, একখানি বই পাঠিয়েছেন কদিন হ'লো—আজটেক্ ও মায়া সভ্যতার মেক্সিকোরও দুখানা মূর্ত্তি আছে) তার থেকে একটা মূর্ত্তির ছবি আঁকছিলাম, আঁকবার সময়, আদি কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত পাথরে মাটীতে কাঠে যত মূর্ত্তি গড়েছে—এঁকেছে সবেরই এমন একটা তত্ত্ব মনে এল অঙ্কের মত যা— আজকার মানুষকে জানাবার ও জানবার কথা মনে হচ্চে, কিছু এঁকে ও কিছু লিখে রাখব, আপনি এলে এর আলোচনা করা যাবে। ইরা ও তারা মা কাশ্মীর গেছে—, আপনি একটু সুস্থ বোধ করছেন আজ এই টুকুই যথা লাভ। কল্যাণীয়া বৌমাকে ও পপাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আপনি শুভ কামনা গ্রহণ করবেন। ইতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২।৩।৫৯

প্রিয়বরেষু

পটল মণ্টু—কারিগর (নিপুণ) এমনি একটা চলতি—কাজের মধ্যে কারিকরের জন্ম—যুগ যুগ ধরে, এই কারিকরের জন্ম—যুগ যুগ ধরে, এই কারিকরের হাজার—শত মধ্যে—একজনের মধ্যে—যেমন বহুদিন, রাজা ও সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় চলে, তখন নানা গ্লানি—বহু লোকের—কারিগর জনসাধারণের ব্যবহারে—ভগ্ন দশায়, অথবা মলিন অবস্থায় আসে তখনই স্বাভাবিক নিয়মে পরিষ্কার করার, যুগ এসে পড়ে, সমাজের সব কিছুতেই— ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম—প্রতিদিন—প্রতি ঋতু পরিবর্ত্তনের ইহাই নিয়ম।

[অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

৪।৩।৫৯

প্রিয়বরেষু

অভিনেতা—দেবতা সেজে—আঁকা পটভূমি—

রাজা সেজে—মানুষের তৈরী ডাকসাজের

ভিখারী সেজে—পটভূমিতে বসা—

আজকাল দেখি সাহিত্যিক, দার্শনিক

রাজনীতিবিদ—সকলেই সেই রূপসজ্জায়

পটভূমিতে বসে বক্তৃতা দিচ্ছে,

আরামে বসে সিগারেট ফুকছে, তখন

মনে হয় এরা হয় পাথর নয় অভিনেতা

[অসমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরি=

২১।১০।৬০

প্রিয়বরেষু=

আপনাকে একটু চিঠি লিখে যে আনন্দ দোব তাও পারি নাই,—কদিন—আগে—জলসর্দ্দি হোয়ে এমন কাশি আরম্ভ হ'য়েছে,—খুব দুর্ব্বল কোরে দিয়েছে—তার উপর খবরের কাগজে চোখ পড়লেই—, (মাইকের আওয়াজ কাণের ভিতর দিয়ে যেয়ে যেমন যন্ত্রণা দেয়,) যন্ত্রণা অনুভব করি, পড়তেই পারি না, ইচ্ছাও হয় না। বীর জনার যুগ বহুদিন পার হ'য়ে, আজ চালাকী জনার যুগ এসেছে, এও জানার দরকার ছিল, মানুষের। তাই এসেছে। জানি, তবু কষ্ট পাই। আপনাদের কথা প্রতিদিন মনে হয় একটু অস্থির হ'য়ে পড়ি, নানা অসুবিধার কথা ভেবে, বিশেষ ক'রে—ইরামাতা ও ছেলেটীর জন্য, আশাকরি আপনার শরীর মন একটু ভাল আছে! কল্যাণীয়া বৌমা কেমন আছেন? আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। সত্যেশ বাবাজীবন ইরা মাতা তারা মা পপা বাবাজীবন, ও দাদুকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন।

এখানে সকলে মোটামুটি ভাল আছে। আপনি আমার শুভকামনা গ্রহণ করবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

১৫।১০।৬১

প্রিয়বরেষু=

আপনার চিঠিটা পেয়ে খুব ভাল লাগল, অল্পর মধ্যে এমন একটা তৃপ্তি পাই যা জানান যায় না। পটলেরও চিঠি পেয়েছি—ছেলে দুটা খুব আনন্দে আছে।

ওখানে দাদুটাও নিজে ত আনন্দে আছেই আপনাদেরও আনন্দ দিচ্ছে এই মহালাভ! আগে—আপনাকে মাইকের তাণ্ডবে যা যন্ত্রণা দিত—ঠিক সেই রকম যন্ত্রণা পাচ্চি, খবরের কাগজের তাণ্ডবে—এও আর জানান যায় না—কি যন্ত্রণা পাই। তবু—এ সব কিছুরই বিশেষ দরকার মানুষ কি সহজে জাগতে চায়! অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে অপরকে জাগায় নিজেও যায়! আপনার কাছে—বসলেই নানা রকম কথা বলে কষ্ট পাই। লিখতে বসলেও তাই! যাই হোক কোন রকমে একটু বিশ্রাম, প্রাকৃতিক আবহাওয়া শরীরগুলি সকলের ভাল থাকে, এইটুকুই আন্তরিক কামনা করি।

কল্যাণীয়া বৌমার আন্তরিক কর্ম্মকুশলতা—সকলের মূলে। সত্যেন বাবাজীবন, ইরামাতা, দাদুভাইকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি।

কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন।

তারামা আর পপা বাবাজীবনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। আমার শরীর সেই রকমই—তবে একটু কাজকর্ম্মের মধ্যে মনটা দেবার চেষ্টা যাতে ভুলে থাকতে পারি। মাঝেমাঝে সময় কোরে একটা চিঠি দিবেন। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

২৬।৯।৬২

প্রিয়বরেষু

এই মাত্র আপনার চিঠিটা পেয়ে পরম তৃপ্তি পেলাম। স্নায়ুর বিশ্রাম, এটা যে কি জিনিষ তা জানতামই না, এই চার দিন চুপচাপ শুয়ে ব'সে আছি, সেই ঘরটাতে; সমস্ত নীচেটা নিস্তব্ধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটা অজানা শান্ত পরিবেশ, আপনার চিঠিতে ঐ শব্দটা—স্নায়ুর আরাম, পড়ে আরও যেন সজ্ঞান হ'লাম। পটল বেলেতোড়ে গেছে, যাবার আগে আমার সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা, ঘর দুয়ার ছবি গোছ গাছ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রেখে তবে যেতে পেরেছে। মাঝে মাঝে একবার উঠে যাই যেন কাজ করার জন্য ডাকছে, এমন পরিবেশ। তারা একটু সুস্থ বোধ কর্চ্ছে, আপনি একটু শান্তি পাচ্চেন, ইরা, খোকন, কল্যাণীয়া বৌমাও নিশ্চয়ই আনন্দে আছেন, ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা। আমার শুভকামনা গ্রহণ করবেন। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২০।৪।৬৩

পরম প্রিয়বরেষু=

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত বই খানি প্রবন্ধ কিছু ও কবিতাও কিছু—না পুরা কবিতায় লেখা জানালে ভাল হয়। উপরের রূপটার জন্য ভাবছি, শুধু হাল্কা ইণ্ডিয়ান রেড—কিম্বা দুটা রংএ করব—কিনা ভাবছি বেশী রং ব্যবহার করলে ব্লক করতেও খরচ বড্ড বেশী, যাই হোক যে টুকু জানতে চেয়েছে—জানালেই হবে। আগামী কালই পাবেন ছবিটা—আশাকরি সকলে ভাল আছেন। শুভকামনা জানাচ্ছি। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

২৫।৫।৬৪

প্রিয় বরেষু=

সেদিন আপনি যাবার পরই—খুব ঝড় বৃষ্টি,—আপনার খুবই কষ্ট হয়েছিল বাড়ী ফিরতে,—আমি—বাড়ীতে বসেই আপনার কথা ভেবেই অস্থির। এমন —লোকাভাব—কাউকেই পাঠাতে পারি নাই আপনার কাছে। শরীর কেমন আছে জানাবেন। ইরা মাতার খবর জানাবেন। দাদুটীকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। পপা বাবাজীবনকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আপনি শুভকামনা ও ভালবাসা গ্রহণ করবেন। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনার যামিনীদাদা

শ্রীশ্রীহরি

প্রিয়বরেষু=

অনেক দিন কোন খবর নিতে পারি নাই, আপনিও আসতে পারেন [নাই।] আমার অবস্থা লিখে জানাতে সম্ভব নয়। আশাকরি ভাল আছেন। যাই হোক লিখে একটু জানাবেন।

কল্যাণীয়া বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। মীরা পপাবাবাজীবনকে ও ছোট মেয়েরা ও খুখুকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্চি। আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাচ্চি।

ইতি আপনার

যামিনীদাদা